গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬২ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ৪ - ১০ জুন, ২০১০ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা

দোষীদের শাস্তির দাবি জানাল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের যাত্রীদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে ২৮ মে এক বিবৃতিতে বলেন,

আজ ভোর রাত্রে সরডিহা স্টেশনের কাছে মুম্বইগামী জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে নাশকতামূলক কাজের দ্বারা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে শতাধিক মানুষকে হত্যা ও কয়েকশো জনকে আহত করার যে ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। মাওবাদীরাই করুক বা মাওবাদীদের নামে অন্য যারাই করুক, তারা ঘৃণ্য অপরাধ করেছে। আমরা দাবি করছি, (১) অবিলম্বে উপযুক্ত তদন্ত করে দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, (২) রেল এবং সড়ক পরিবহনে যাত্রী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে, (৩) নিহতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও আহতদের উপযুক্ত চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

নিহতদের পরিবারের পাশে সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল

২৮ মে সরডিহায় জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় দেড়শতাধিক নিহত মানুষের মধ্যে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বাসন্তী থানার তালদা গ্রামের ধনঞ্জয় হালদার ও বাবলু হালদার, নপুকুরিয়ার মেঘনাদ নস্কর ও শৈব্যা নস্করও রয়েছেন। আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন আরও বহু মানুষ।

সংবাদ পাওয়ামাত্র জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল ঐ দিনই তালদা গ্রামে ছুটে যান। ২৯ মে তিনি নপুকুরিয়ায় মেঘনাদ নস্করের বাড়ি যান। বাবলু হালদারের পিতা দিবাকর হালদার, ধনঞ্জয় হালদারের স্ত্রী সন্ধ্যারানী হালদার, মেঘনাদ নস্করের সন্তানদের

ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত মেঘনাদ নস্কর ও শৈব্যা নস্করের সন্তান মিলন, রূপচাঁদ ও গঙ্গাধরকে সমবেদনা জানাচ্ছেন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল

সমবেদনা জানান এবং এই পরিবারগুলিকে সমস্ত দিক থেকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। তিনি পিজি হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান এবং তাঁদের চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

দুর্ঘটনায় মৃত ও আহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, অত্যন্ত বেদনাদায়ক এই ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের প্রতি নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। এই ঘটনায় যারা যুক্ত তাদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। ডাঃ মণ্ডল বলেন, এই মৃত্যুর কোনও ক্ষতিপূরণ হয় না। তবুও এর মধ্যে মাননীয়া রেলমন্ত্রীর আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও মৃতদের পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার ঘোষণা অসহায় পরিবারগুলিকে কিছুটা হলেও উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করবে।

মনমোহন সিং বলতে পারলেন না

এক বছরে জনগণ কী পেয়েছে

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ২৪ মে দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে দেশবাসীর উদ্দেশে জানিয়েছেন যে, সরকার মূল্যবৃদ্ধির উপর কড়া নজর রেখে চলেছে। এমনকী তিনি এমন আশাও প্রকাশ করেছেন যে, জিনিসপত্রের দাম ডিসেম্বরের মধ্যে কমতে পারে।

মূল্যবৃদ্ধি গত কয়েক বছরে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কয়েক মাস আগেই মূল্যবৃদ্ধি ২০ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল। মুদ্রাস্ফীতির সামগ্রিক হার ১০ শতাংশের কাছে। যদিও এই শতাংশের হিসাব দেখে, মানুষ কী চূড়ান্ত দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, মূল্যবৃদ্ধি কীভাবে এক বিরাট অংশের মানুষকে অনাহার-অর্ধাহারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তা বোঝা যাবে না। কারণ যাঁরা এ হিসাব কষেন বা নিয়মিত সংবাদমাধ্যমে তার ফিরিস্তি দেন, তাঁদের বেশিরভাগেরই এই মানুষগুলির সাথে কোনও যোগ নেই। তাঁরা গড় হিসাব কষতেই অভ্যস্ত। একইরকমভাবে বিলাস-ব্যসন, আরাম-আয়েসের জীবনে অভ্যস্ত দেশের এই সমস্ত নেতা-মন্ত্রীরাও বোঝেন না মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে কী চরম দুর্গতির মধ্যে নামিয়ে আনে। হিসাব কষে বুঝলেও তার কষ্ট অনুভব করেন না। করেন না বলেই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বছরের পর বছর মিথ্যা স্তোকবাক্যে দেশের মানুষকে এমন করে প্রতারিত করে চলেছেন তাঁরা।

সেদিনের সাংবাদিক সম্মেলনের উল্লেখ করে একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র লিখেছে, ‘‘প্রধানমন্ত্রী আজ প্রত্যয়ের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, জিনিসপত্রের দাম ডিসেম্বরের মধ্যে কমবে বলে সরকার আশা করছে।’’ দাম কমবেই— এমন কথা প্রধানমন্ত্রী বলেননি। তা হলে তাঁর কথার মধ্যে ‘প্রত্যয়’ কীভাবে দেখতে পেলেন তাঁরা? আসলে এমন প্রত্যয় নিয়েই এই সমস্ত নেতা-মন্ত্রীরা জনসাধারণের সমস্যাগুলির মোকাবিলা করেন। এই প্রত্যয় নিয়েই মন্ত্রীরা বারবার বলে চলেন— আর কয়েক মাসের মধ্যেই জিনিসপত্রের দাম কমবে। যেমন কয়েক মাস আগেও প্রধানমন্ত্রী থেকে অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী, কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ার বলেছিলেন, মার্চ-এপ্রিল নাগাদ নতুন ফসল উঠলেই দাম কমবে। মে মাস চলে গিয়ে জুন চলে এল, চাল-ডালের দাম কমল কই? দেশের মানুষের নিশ্চয় মনে পড়বে নয়ের দশকের গোড়ায় বিশ্বায়ন-উদারনীতি চালুর সময়ে ‘প্রত্যয়ী’ অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর কথা। সেদিন তিনি বলেছিলেন, দশটা বছর অপেক্ষা করুন, উদারনীতির সুফল দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। দেশ থেকে দারিদ্র দূর হয়ে যাবে। তার পর দশ বছর শুধু নয়, বিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক নিয়োজিত সাক্সেনা কমিটি তার রিপোর্টে বলেছে, দেশের ৫০ শতাংশ, অর্থাৎ অর্ধেক মানুষই দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। ২০০৬ সালে প্রকাশিত অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটির রিপোর্ট দেখিয়েছিল, ভারতের ৭৭ শতাংশ মানুষের জীবনধারণের জন্য দৈনিক খরচ ২০ টাকা বা তার থেকে কম। তা হলে প্রধানমন্ত্রীর কি আজ এ কথা স্বীকার করা উচিত ছিল না যে, ‘উদারনীতি’র নামে তাঁরা যে নীতি নিয়ে চলেছেন, তার দ্বারা সাধারণ মানুষের কল্যাণ হয়নি? পরিবর্তে তিনি আর্থিক বৃদ্ধির গল্প শুনিয়েছেন। মন্দার আগে ৪ বছর দেশে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৯ শতাংশ। ২০০৮-০৯ সালে মন্দার ধাক্কায় তা নেমে আসে ৬.৫ শতাংশে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘‘পরের বছরই পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় সেই হার বেড়ে হয় ৭.২ শতাংশ। চলতি অর্থবর্ষে আর্থিক বৃদ্ধির হার সাড়ে আট শতাংশের কাছাকাছি যাবে। তাই ভারতীয় অর্থনীতির স্বাস্থ্য ভাল নয় বলে যে সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে, তা ঠিক নয়।’’ উপরে উল্লিখিত সরকার নিয়োজিত দু’টি কমিটির রিপোর্টই বলে দেয় ভারতীয় অর্থনীতির সুস্বাস্থ্য বলতে প্রধানমন্ত্রী যা বুঝিয়েছেন, তার সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসীর কোনও সম্পর্ক নেই।

এই ‘আর্থিক বৃদ্ধি’ (ইকনমিক গ্রোথ) বলতে প্রধানমন্ত্রী কী বুঝিয়েছেন? এই বৃদ্ধি বলতে যদি মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি-আমলা-

সাতের পাতায় দেখুন

পুর পরিষেবাতেও নাগরিকদের নয়, কর্পোরেট হাউসের স্বার্থই দেখা হচ্ছে

প্রেস ক্লাবে মিট দ্য প্রেসে কমরেড সৌমেন বসু

(সদ্য সমাপ্ত পুর নির্বাচনের আগে ২৫ মে কলকাতা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, পুর নির্বাচন নিয়ে দলের বক্তব্য উপস্থিত করার জন্য। ওই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ছাড়াও ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী ও কমরেড স্বপন ঘোষ। ইতিমধ্যে নির্বাচন শেষ হয়ে গেলেও আমাদের দলের নীতিগত অবস্থানটি কী ছিল তা জনগণকে জানানো প্রয়োজন মনে করেই আমরা সেটি প্রকাশ করছি।)

কমরেড সৌমেন বসু বলেন, প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও সাংবাদিক বন্ধুদের অভিনন্দন জানিয়ে আমি প্রথমেই স্মরণ করছি স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান বিপ্লবী সুভাষ চন্দ্র বসুকে, পরাধীন ভারতবর্ষে যিনি কলকাতা কর্পোরেশনে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদ অলংকৃত করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রশাসন পরিচালনার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা ও মমত্ব থেকে তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং তা দৃষ্টান্তস্বরূপ। কলকাতা পৌর নাগরিকদের সুযোগ সুবিধার প্রশ্নে ও দুর্নীতিমুক্ত পুরসভা পরিচালনায় তাঁর কর্মযজ্ঞ আজও অনুসরণীয়। কিন্তু তা অনুসরণের কোনও চেষ্টাই করেননি ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে কংগ্রেস, সিপিএম দলের নেতৃত্বে যাঁরা পুরসভা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে যে মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ সামাজিক কর্মকান্ডে পরিলক্ষিত হয়েছিল, আজ তা বিরল।

আমি প্রথমেই নাগরিক অধিকার রক্ষার বিষয়ে দুই-একটি কথা বলতে চাই। আপনারা জানেন, ১৯৭২ সালে পুলিশি ও দলীয় পেশিশক্তির জোরে ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সর্বাত্মক রিগিং করে কংগ্রেস পশ্চিমবাংলায় নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছিল। ওই কলঙ্কিত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস সরকারি ক্ষমতা করায়ত্ত করেছিল এবং সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসেছিলেন। খ্যাতিমান সাংবাদিক প্রয়াত বরুণ সেনগুপ্ত তাঁর দৃষ্টিতে এই অধ্যায়ের একটি গবেষণা গ্রন্থ ‘বাহাত্তরের ভোট’ প্রকাশ করেছিলেন। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ক্ষমতায় বসার পরই কলকাতা পুরসভার নির্বাচিত বোর্ড ভেঙে দেন এবং পরিবর্তে তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে পৌরবোর্ড গঠন করেন। যে কংগ্রেসের কাছে গণতান্ত্রিক নির্বাচন নয়, যেকোনও রাস্তায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়াই একমাত্র লক্ষ্য, তারাও আসন্ন নির্বাচনে গণতন্ত্র রক্ষার স্লোগান নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এ বিষয়ে

চারের পাতায় দেখুন

গোসাবায় আয়লা দুর্গতরা অনশন করে দাবি আদায় করলেন

গত বছর ২৫ মে বিধ্বংসী আয়লা ঝড়ের এক বছর পর এ বছর ২৪ মে গোসাবার 'আয়লা দুর্গত নাগরিক কমিটি' বর্ষা শুরুর আগে ২০ ফুট উঁচু নদীবাঁধ, তালিকাভুক্ত সকল পরিবারের ক্ষতিপূরণের এককালীন টাকা, সকল কৃষকের ঋণ মকুব করে বিনামূল্যে বীজধান ও ফসল না ওঠা পর্যন্ত ত্রাণের দাবিতে বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান শুরু করে। বিডিও দাবি না মানায় বেলা ৩টা থেকে ওই মঞ্চেই অনির্দিষ্টকালীন অনশন শুরু করেন কমিটির পক্ষে ৪৩ জন দুর্গত মানুষ। রাত ১২টায় বিডিও কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমিটির সম্পাদক বিকাশ শাসমল, চন্দন মাইতি, বিশ্বেশ্বর গিরি ও ডাঃ তাপস সরকার। বিডিও আশ্বাস দেন, ক্ষতিপূরণ না পাওয়া ৩৮ হাজার পরিবারের মধ্যে মাত্র ১০ হাজার পরিবারকে ১০ কোটি টাকা দেওয়া হবে এবং জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত নদীবাঁধ মেরামত করা হবে। কমিটি জানায়, সরকারের নিজের গঠিত ফোরম্যান কমিটির দ্বারা তৈরি তালিকার সকল পরিবারকে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না দেওয়া পর্যন্ত অনশন চলবে। পরদিন সকালে কমিটির উদ্যোগে আয়লায় মৃত ব্যক্তিদের স্মরণে গোসাবা বাজারে বেদি স্থাপন করে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যাপক মানুষ অনশনকারীদের পাশে এসে সমবেত হতে থাকেন। বেলা ৩টায় ক্যানিং এসডিও, বিডিও এবং গোসাবা থানার পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিতে কমিটির আলোচনা পুনরায় শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত এসডিও প্রতিশ্রুতি দেন, জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই বিডিওতে জমা পড়া সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে টাকা দেওয়া হবে, সমস্ত নদীবাঁধ মেরামত করা হবে এবং সকল চাষিকে বিনামূল্যে বীজধান বণ্টন করা হবে। বিডিও-র প্রতিনিধি ও থানার প্রতিনিধি মঞ্চে উঠে সহস্রাধিক আন্দোলনকারীর সামনে ওই লিখিত প্রতিশ্রুতি পাঠ করে শোনান। কমিটির পক্ষ থেকে ডাঃ তাপস সরকার বলেন, প্রশাসন প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে আন্দোলন আরও ব্যাপক হবে। বিকেল ৫টায় অনশন প্রত্যাহার করা হয়। দাবি আদায়ের এই আন্দোলন আয়লা বিধ্বস্ত জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

হোসিয়ারি শ্রমিকদের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন

অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৩ মে, দেউলিয়া হীরারাম হাইস্কুলে। জেলার কোলাঘাট, পাঁশকুড়া, মাতঙ্গিনী ব্লক সহ বিভিন্ন এলাকায় হোসিয়ারি কারখানা গড়ে উঠেছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সিদ্ধেশ্বরী, লাক্স কোজি, ভোরা প্রভৃতি কোম্পানিগুলি কম বেতনে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য এইসব গ্রামাঞ্চলে কারখানাগুলি গড়ে তোলে। মালিকরা অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে শ্রমিকদের আইনসঙ্গত প্রাপ্যগুলি থেকে বঞ্চিত করে। এই অবস্থায় শ্রমিকরা অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সির নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। শ্রমিকদের পরিচয়পত্র প্রদান, বাঁচার মতো মজুরি, ২০ শতাংশ হারে বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইএসআই, সপ্তাহে ১ দিন ছুটি, সরকারি ছুটির দিনগুলিতে সবেতন ছুটি, ছাঁটাই বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে তারা এই সম্মেলন আহ্বান করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মূল্যবৃদ্ধি ও কালোবাজারির জন্য সুতোর অভাবে সারা রাজ্যে প্রায় ৬০০-র মধ্যে দেড়শোর উপর কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আরও তিনশ কারখানা বন্ধ হওয়ার মুখে। রাজ্য সরকারের অধীন সংস্থা কল্যাণী স্পিনিং মিল লিমিটেডে মেশিন অপারেটরের অভাবে উৎপাদন বন্ধ হয়ে আছে। কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তর সূত্রে খবর, আর সপ্তাহখানেক এমন পরিস্থিতি চললে বাকি কারখানাগুলিও বন্ধ হয়ে যাবে। কিছুদিন আগে সুতোর দাম আকাশছোঁয়া হওয়ায় ৩০ শতাংশ উৎপাদন ছাঁটাই করেছিল কলকাতা সহ রাজ্যের হোসিয়ারি কারখানাগুলি। সেই সময়ে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পমন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছিলেন, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। কিন্তু তাঁর আশ্বাসই সার। কোনও সমাধান হয়নি। ফলে মূল্যবৃদ্ধির বোঝা ঘাড়ে নিয়েই কাজ হারানোর আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন রাজ্যের প্রায় দেড় লক্ষ হোসিয়ারি শ্রমিক।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের জেলা শাখার সভাপতি মধুসূদন বেরা। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের সম্পাদক নেপাল বাগ। দাবি সনদ সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেন আশীষ সামন্ত। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে ৩৬৮ জন শ্রমিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড দীপক দেব, হলদিয়া পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড ফণীভূষণ চক্রবর্তী, জেলার অন্যতম জে পি এ নেত্রী কমরেড লীলা শী।

প্রধান বক্তা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য হোসিয়ারি শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে আগামী দিনে মজুরিবৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনকে তীব্রতর করার আহ্বান জানান। সবশেষে মধুসূদন বেরাকে সভাপতি এবং নেপাল বাগ ও তাপস মান্নাকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৪২ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। সমগ্র কর্মসূচি পরিচালনা করেন নারায়ণ চন্দ্র নায়ক।

রেল দুর্ঘটনায় বুদ্ধিজীবী মঞ্চের গভীর শোকপ্রকাশ

২৭ মে গভীর রাতে খড়গপুরের অদূরে সরডিহায় ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পক্ষ থেকে ২৯ মে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে,

এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তরে দার্জিলিং ও দক্ষিণে খড়গপুর, উভয় স্থানে নাশকতার ঘটনা ঘটেছে, যা সন্ত্রাসমূলক। দার্জিলিংয়ে মদন তামাং পুলিশি ব্যবস্থাপনার মধ্যেই আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন, আর খড়গপুর পার হয়ে যাত্রীবাহী ট্রেন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে নাশকতামূলক কাজের ফলে; এবং সেই ট্রেনের উপর মালগাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এ পর্যন্ত জানতে পারা গেছে শতাধিক নিহত ও অজস্র আহত হয়েছেন। প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, পাহাড় থেকে সমতল পশ্চিমবঙ্গে কোথাও আইন শৃঙ্খলা নেই। এই ভয়ঙ্কর ঘটনাকে নিন্দা করার কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়। আমরা দাবি করি এই সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মের পিছনে কোন শক্তি আছে তা খুঁজে বের করতে হবে ও দোষীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

আমরা লক্ষ করছি, পুরনির্বাচনের মুখোমুখি এতবড় রেল দুর্ঘটনা ঘটল। ইতিপূর্বে একজন রাজনৈতিক নেতা নির্বাচন রক্তাক্ত হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলে জনসাধারণকে শঙ্কিত করেছিলেন। এই ঘটনা তাহলে কোন সন্ত্রাসমূলক শক্তি ঘটিয়েছে সে ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ হয়।

আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ফিরে আসুক, শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হোক, আর্ত মানুষ নিরাময় পাক এবং দোষীদের কঠিন শাস্তি হোক। আমরা আহতদের জন্য বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ দাবি করছি এবং টাকা দিয়ে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হয় না জানা সত্ত্বেও মৃতদের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করছি এবং আহত ও নিহতদের পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

নিবেদক ঃ তরুণ সান্যাল, বিভাস চক্রবর্তী, মীরাতুন নাহার, পল্লব কীর্তনীয়া, সুজাত ভদ্র, দিলীপ চক্রবর্তী, তরুণ নস্কর, সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, রূপশ্রী কাহালি, বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, অসীম গিরি, গণেশ বসু, অজন্তা ঘোষ, সান্টু গুপ্ত, চৈতালি দত্ত।

উত্তর দিনাজপুরে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত মানুষদের ত্রাণ বিতরণ

করণদিঘী, রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ ব্লকের ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত মানুষের হাতে ৫ দফায় ত্রাণ তুলে দিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি। চাল, ত্রিপল, কাপড় এবং গৃহনির্মাণের জন্য নগদ ৫০০ এবং ৩০০ করে টাকা সম্পূর্ণ ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঝড়ে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর পাঠ্যপুস্তক নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হয়। পরিলক্ষিত হয়েছে, যা খুবই বেদনার। এখনও মানুষ এক চিলতে ত্রিপলের অভাবে খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছে। গৃহ নির্মাণের অর্থ পাওয়ার এখনই কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। গত বছরের আয়লা দুর্গত মানুষেরা এখনও তাদের ক্ষতিপূরণের অর্থ পায়নি। আমাদের দল সেখানেও দুর্বার আন্দোলন করছে। আপনাদেরও গৃহনির্মাণের অর্থের জন্য দুর্বার আন্দোলন করতে হবে। রাজ্য

ত্রাণ বিতরণ করছেন কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস। পাশে কমরেড রতন মুখার্জী।

দলের মেডিকেল ইউনিটের উদ্যোগে করণদিঘী এবং হেমতাবাদ ব্লকে ৮ এবং ৯ মে সারাদিনব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়। এই ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে দুর্গত মানুষদের হাতে ত্রাণ তুলে দেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস। কমরেড মুখার্জী বলেন, আমাদের দলের কর্মীরা মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরে এই অর্থ এবং ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করেছে। গোটা রাজ্যে এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় ত্রাণসংগ্রহ অভিযান চালানো হয়। যেভাবে ধ্বংসলীলা ঘটেছে, জেলার যে বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, আমাদের এই ত্রাণ সেই সমস্ত মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারবে না। একমাত্র সরকারের পক্ষেই সকলের ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব। কিন্তু ত্রাণ বণ্টনে এবং গৃহনির্মাণের অর্থপ্রদানে সরকারের চরম অবহেলা ও মিথ্যাচার

কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, ত্রাণের দাবিতে আপনারা ইতিপূর্বেই বিভিন্ন ব্লকের বিডিওকে ডেপুটেশন, ঘেরাও, রাস্তা অবরোধ এবং ডি এম ডেপুটেশনের মাধ্যমে আন্দোলন করেছেন। হৃদয়হীন সরকারের কানে দুর্গত মানুষদের দাবি পৌঁছাতে হলে আন্দোলনই একমাত্র পথ। তাই আমি জোরদার আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানাচ্ছি। ত্রাণবণ্টন পরিচালনা করেন জেলা সম্পাদক কমরেড দুলাল রাজবংশী।

উপস্থিত এক ব্যক্তি বলেন, সরকারি দলের নেতারা গাড়ির কনভয় নিয়ে গ্রামে ঢুকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, পত্রিকায় ছবি বেরোচ্ছে। কিন্তু মানুষ কিছু পাচ্ছে না। উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিরা ত্রাণ সরবরাহে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কর্মীদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

চাল, ত্রিপল, কাপড়, ওষুধ, বই মিলে চার লক্ষ টাকার ত্রাণ বণ্টন করা হয়।

কপিল সিবালকে মার্কিন পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত

কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী কপিল সিবালকে আমেরিকার ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন 'স্টিফেন পি ডুগান' পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। আগামী সেপ্টেম্বরে তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। কেন এই পুরস্কার? সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর 'অবদানের' জন্য এই পুরস্কারটি দেওয়া হচ্ছে। পুরস্কারটি যোগ্য পাত্রেই অর্পণ করা হয়েছে সন্দেহ নেই! শিক্ষা সম্প্রসারণের নামে যেভাবে শিক্ষাকে বাজারের পণ্যে পরিণত করার চেষ্টা তিনি করছেন, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারিকরণ করছেন, গ্যাটস (জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যান্ড সার্ভিসেস) চুক্তি অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রকে পুঁজিপতিদের অবাধ মুনাফার জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন এবং সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করছেন তাতে খুশি হয়ে আমেরিকার এই সংস্থাটি তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ক্ষমতায় এসেই তিনি তাঁর একশো দিনের কাজের লক্ষ্য হিসাবে সরকারি বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, মাধ্যমিক পরীক্ষাকে ঐচ্ছিক করা, শিক্ষার সার্বিক বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করা, ইউ জি সি, এ আই সি টি ই, এম সি আই প্রভৃতি নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে তুলে দিয়ে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে এন সি এইচ ই আর নামক একটি মাত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থার অধীনে নিয়ে আসা, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এ দেশে শাখা খুলে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া প্রভৃতি এক গুচ্ছ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর তৎপরতা শিক্ষা ব্যবসায়ীদের উল্লসিত করেছে। তিনি যে 'কাজের মানুষ' তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট সংসদে পাশ করিয়ে নিয়েছেন। ফরেন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস (রেগুলেটিং, এন্ট্রি অ্যান্ড অপারেশন) বিল ২০১০ সংসদে পেশ করেছেন। তাঁরা দেখাতে চাইছেন যে তাঁরা দেশে শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে কতটা আন্তরিক। বাস্তবে তাঁরা ভাল ভাল কথার আড়ালে এ দেশে শিক্ষার ভিতকে ধ্বংস করতেই সচেষ্ট।

স্বাধীনতার পর কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির কাছে পেশ করা সংবিধানের খসড়ায় শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত ধারাটি মৌলিক অধিকারের মধ্যে রাখা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যা কার্যকর করা বাধ্যতামূলক নয়। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল— দশ বছরের মধ্যে সকলের জন্য বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে। বুনিয়াদি শিক্ষা তো দূরের কথা, স্বাধীনতার ৬২ বছর পরও দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা অনেক। শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি কোনও সরকারই মানেনি। অবশেষে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হল শিক্ষার অধিকার আইনে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, তা হলে এতদিনে সরকার শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিল। কিন্তু একটু বিচার করলেই দেখা যাবে, এই আইন অনুসারে সরকার শিক্ষার দায়িত্ব অভিভাবকদের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছে। আইনে বলা হয়েছে, কোনও অভিভাবক তাঁর সন্তানকে বিদ্যালয়ে না পাঠালে তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যেখানে দেশে অধিকাংশ মানুষ গরিব, সেখানে অভিভাবকরা বাধ্য হয়েই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁর শিশু সন্তানকে কাজে পাঠাতে বাধ্য হন। এই পরিবারগুলির দু'বেলা দু'মুঠো অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা থাকলে কোনও অভিভাবকই স্কুলে না পাঠিয়ে তাঁর সন্তানকে কাজে পাঠাতেন না। এই হল শিক্ষার অধিকার!

১৯৮৬ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী প্রণীত জাতীয় শিক্ষা নীতিতে প্রথম বলা হল, এডুকেশন ইজ এ ইউনিক ইনভেস্টমেন্ট। অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও মুনাফা অর্জনের দরজা খুলে দেওয়া হল। কপিল সিবাল তথা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তাকেই ভাল ভাল কথার আড়ালে আরও ধূর্ততার সঙ্গে কার্যকর করছেন। তাঁরা শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করছেন এবং সমাজে দু'ধরনের নাগরিক তৈরি করতে চাইছেন। এক দল, যাদের অর্থ আছে, তাদের সন্তানরা উচ্চ বেতন দিয়ে বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়বে। সেখানে পাশ-ফেল থাকবে, শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকবে। এই সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার যোগ্য হবে, উচ্চশিক্ষা লাভ করবে। আর সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যেহেতু কিছুই না শিখে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, তাই তারা উচ্চশিক্ষার দরজায় যেতে পারবে না। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়ার সুযোগও এদের থাকবে না। পুঁজিবাদের সংকট যত বাড়ছে, চাকরির সুযোগও তত কমছে। ফলে যেটুকু চাকরি আছে সেগুলি মুষ্টিমেয় ধনীর সন্তানরাই পাবে, আর সাধারণ পরিবারের সন্তানরা চাকরি না পেয়ে নিজেদের অযোগ্যতাকে বা ভাগ্যকে দোষ দেবে, পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থাই যে তাদের চাকরি না পাওয়ার কারণ তা তারা ধরতে পারবে না। বাস্তবে স্বাধীনতার পর থেকেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি শিক্ষা সংকোচনের নীতি নিয়ে চলেছে। এতদিন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমানোর জন্য উচ্চশিক্ষাকে সংকোচন করা হয়েছে, এখন শিক্ষা সম্প্রসারণের নামে ব্যয়বহুল করে দিয়ে শিক্ষাকে কেবলমাত্র ধনিক শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করার ধূর্ত প্রয়াস চলছে। শিক্ষার বাণিজ্যিকী-করণ ও বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে যাতে তীব্র মন্দা ও বাজার সংকটের ফলে পুঁজিপতিরা তাদের অলস পুঁজি শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে পারে।

পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কপিল সিবালের ভূমিকায় মার্কিন শিক্ষা ব্যবসায়ীরা তাঁকে যে পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা চূড়ান্ত লজ্জার।

ফিলিপিন্স

ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের জয়

ফিলিপিন্সে সরকার পরিচালনাধীন কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একতরফা ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে বাধ্য করল ছাত্রদের দৃঢ় সংঘবদ্ধতা ও অদম্য প্রতিরোধ সংগ্রাম।

গত মার্চ মাসের মাঝামাঝি সে দেশের সরকারি পরিচালনাধীন সর্ববৃহৎ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ টি ক্যাম্পাসে ইউনিট প্রতি ২০০ পেসো পর্যন্ত ফি বৃদ্ধির একতরফা নোটিশ জারি হল, সংশ্লিষ্ট কারও সাথে কোনও রকম আলোচনা না করেই, আচমকা। যেখানে শ্রমিক কর্মচারীদের সাপ্তাহিক রোজগার মাত্র ১৭০০ পেসো, যেখানে ৬০,০০০ ছাত্রের অনেকেই গরিব ও প্রান্তিক, অর্ধবেকার শ্রমিক পরিবার থেকে আসে, সেখানে এই বিপুল ফি বৃদ্ধি অনেক ছাত্রকেই অসহায় হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতে বাধ্য করেছে। সাধারণ বাজেটে সাড়ে ৪ কোটি পেসো ছাঁটাই, দুর্নীতি ও সরকারি রাজস্বের নয়ছয় হওয়ার দায় সামলাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বিরাট পরিমাণ বোঝা চাপিয়ে দিল।

ঠিক দু বছর আগে ইউনিভার্সিটি অফ ফিলিপিন্স ফি বাড়িয়েছে ৩ গুণ। কিন্তু এবার ছাত্ররা তাদের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দিল। ধারাবাহিক প্রতিবাদ সভা, তারপর উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে বিক্ষোভ। সেখানে গ্রেপ্তার হল পাঁচজন ছাত্রনেতা। আন্দোলন কিন্তু নেতৃত্বহীন হল না। নবীন নেতৃত্ব সামনে এগিয়ে এল। বিশাল ছাত্র জমায়েত হল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওপরের বারান্দা থেকে শ'য়ে শ'য়ে চেয়ার টেবিল ছুঁড়ে ফেলা হল নিচে, জলে উঠল আগুন।

পরের সপ্তাহ থেকে আবার চলতে থাকল বিক্ষোভ মিছিল, জমায়েত। এবং তা দৃষ্টি আকর্ষণ করল অন্যান্য শাখার ছাত্রদের ও স্থানীয় নাগরিকদের। গড়ে উঠল জনমত। প্রমাদ গণল কর্তৃপক্ষ। অবশেষে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হল বর্ধিত ফি ও পাঁচ ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিতে। তারা মুক্তি পেল। প্ররোচনা, হিংস্রতা, ভীতিপ্রদর্শন— এই সবই ফিলিপিন্স সরকার ও তার দালালরা চালিয়ে যাচ্ছে। তবু যে দৃঢ় মনোবল ছাত্ররা ও তাদের সহমর্মীরা দেখিয়েছে, তা সমাজের শুভশক্তিকে ভরসা দিচ্ছে যে, সমস্ত অশুভ পরিকল্পনাই পরাস্ত করা সম্ভব অটল কর্তব্যবোধ, দৃঢ় সংহতি প্রশান্ত সাহসিকতায়।

আন্দুল-মৌড়ীতে শিক্ষা কনভেনশন

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া, স্কুল স্তরে যৌনশিক্ষা চালু এবং শিক্ষার সার্বিক বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের প্রতিবাদে ২৩ মে হাওড়া জেলার আন্দুল-মৌড়ী এলাকার 'মহীয়াড়ি পাবলিক লাইব্রেরি হল'-এ শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিত্ব করেন মহীয়াড়ি কুণ্ডু চৌধুরী হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুবীর কুমার ঘোষ। সভায় মূল প্রস্তাব পাঠ করেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী গৌতম ঘোষাল। সভা সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার পীযূষ ভদ্র। শিক্ষানুরাগী শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জীবনকৃষ্ণ মান্না, অধ্যাপক বি আর প্রধান, ডঃ দিলীপ ভট্টাচার্য, ডাঃ পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, শিক্ষক অনিলবরণ সাউ, শিক্ষিকা ভবানী মুখার্জী প্রমুখ এবং অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষে প্রাক্তন শিক্ষক তপন কুমার সামন্ত ও অধ্যাপক দেবাশিস আইচ।

পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিকে পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষা যেভাবে ধ্বংস হয়েছে, তা উল্লেখ করে বক্তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, আগামী দিনে মাধ্যমিক শিক্ষাকেও একইভাবে গরিব-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। পাশাপাশি ন্যাশনাল নলেজ কমিশন, যশপাল কমিটি ও লিংডো কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের দরজা হাট করে খুলে দেওয়া হবে। দেশের প্রতিটি শিক্ষানুরাগী মানুষকে এই সর্বনাশা শিক্ষানীতি প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার জন্য তাঁরা আহ্বান জানান।

সুবীর কুমার ঘোষকে সভাপতি, গৌতম ঘোষালকে সম্পাদক এবং সৌমেন ভান্ডারীকে কোষাধ্যক্ষ করে আন্দুল-মৌড়ী সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

মেদিনীপুরে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সপ্তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ অডিটোরিয়ামে ২৩ মে ৫০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এম এস সি-র রাজ্য সম্মেলনে ৪৬ জন রাজ্য কমিটির সদস্য ও ৫৮ জন রাজ্য কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হন। ডাঃ সুভাষচন্দ্র চক্রবর্তী সভাপতি ও ডাঃ বিজ্ঞান বেরা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সাড়ে তিন বছরের ডাক্তারি কোর্স, এম সি আই ভেঙে দেওয়া, ডাক্তারি শিক্ষায় ব্যাপক ফি-বৃদ্ধি ও ক্যাপিটেশন, ওষুধের দামবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারিকরণ প্রভৃতির প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান নিয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

একের পাতার পর

তাদের নিশ্চয়ই জবাব দিতে হবে।

১৯৭২ এর পর '৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সি পি এম ক্ষমতায় আসীন হয়। কলকাতার নাগরিকরা মনে করেছিলেন, '৭৭ এর নির্বাচনে বিপুল সাফল্যের সাথে যে সি পি এম ক্ষমতায় আসীন হল, তারা নিশ্চয়ই দ্রুত পৌর নির্বাচন করবে। কিন্তু সি পি এম ফ্রন্ট সরকার প্রথম পৌর নির্বাচনের ব্যবস্থা করল ৮ বছর বাদে ১৯৮৫ সালে। যতদিন না তারা নিশ্চিত হয়েছে যে, নির্বাচন হলে তারাই জিতবে, ততদিন পুর নির্বাচনও করেনি। এই হচ্ছে তাদের গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতার নমুনা। অথচ বক্তৃতায় সিপিএম নেতারা সিদ্ধার্থ রায়ের থেকেও বেশি দক্ষতায় গণতন্ত্রের সমর্থনে বড় বড় কথা বলেন।

মিট দ্য প্রেসে কমরেড সৌমেন বসু

কমরেড সৌমেন বসু বলেন, আজ কলকাতায় নাগরিক পরিষেবার অবস্থা কী? পৃথিবীতে এখন এমন কোনও আধুনিক সভ্য মহানগর আছে কিনা জানা নেই, যেখানে সেই আদিকালে যে সমস্ত রোগ ছিল-- ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক, কলেরা, জন্ডিস, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগ এখন কলকাতার মতো এত ব্যাপক। এই সমস্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর এই শহরে শত শত মানুষের জীবনহানি ঘটে। এর প্রতিরোধে পুরসভাকে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। পৌর নাগরিকদের ন্যূনতম প্রয়োজন যে বিশুদ্ধ পানীয় জল তা এই রাজ্যের পুরসভাগুলিতে এমনকী কলকাতাতেও পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে আন্ত্রিক, কলেরা, আর্সেনিক দূষণ বছরে বছরে মহামারীর আকার নেয়। অথচ উন্নয়নের জন্য কলকাতা পুরসভা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করেছে। সে টাকা কোন উন্নয়নে যায়, কার উন্নয়নে লাগে? এই ঋণ যাদের শোধ করতে হবে সেই কলকাতার নাগরিকদের কি তার হিসাব চাওয়ার অধিকার নেই? বিপুল পরিমাণ ঋণের টাকায় ক'টি বস্তির তাঁরা উন্নয়ন করেছেন? বস্তির গরিব মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন? কলকাতা সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলের মানুষ দারিদ্রের জ্বালায় যারা কলকাতার ফুটপাথে এসে বাস করতে বাধ্য হয় — ফুটপাথে জন্মায়, ফুটপাথে মরে— তাদের কী ব্যবস্থা এই সরকার করেছে? সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের আমলে কী হয়েছে, আর পরবর্তীকালে জ্যোতিবাবু, বুদ্ধবাবু এবং বিমানবাবুরা কী করেছেন, এর উত্তর কংগ্রেস - সিপিএমকে দিতে হবে।

সকলেই জানেন, বিপুল পরিমাণ এই টাকা দিয়ে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কর্তাদের, বিত্তবানদের সুবিধা দিতে তৈরি হচ্ছে ফ্লাইওভার। তাদের চলাচলের তো সুবিধা করে দিতে হবে, তাদের আরামের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ কর্পোরেট হাউসের বিপুলায়তন টাকার পাহাড় আজকে ভেসে আসছে কলকাতায়, পশ্চিমবাংলায় ব্যবসার জন্য। আর এ সব কন্সট্রাকশন থেকে সরকারি কর্তাব্যক্তিদের পকেটে ঢুকছে বিপুল পরিমাণ কাটমানি। এ সবের কোনও হিসাব তাদের জনসমক্ষে দিতে হয় না। তাই গরিবের উন্নয়ন, বস্তিবাসীর উন্নয়ন এ কথাগুলি নিতান্তই ফাঁকা বুলি — বলতে হয়, না বললে ভোটের বাজারে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় না, তাই বলে। এমনকী কলকাতায় বহু যুগ ধরে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত যাঁরা বসবাস করেন, তাঁদের পূর্বপুরুষরা যে বাড়ি করে গিয়েছেন, অভাবের জন্য তারা সেসব বাড়ি সংস্কার করতেও পারছেন না। যে পরিমাণ ট্যাক্স, জলের কর ও অন্যান্য কর প্রতি বছর বাড়ানো হচ্ছে, আর যেভাবে নতুন নতুন বিধি প্রণয়ন করা হচ্ছে, তাতে পুরানো বাড়ির সংস্কার করা দুঃস্থ মালিকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলে তাঁরা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এই ক্ষেত্রে কর কমিয়ে তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব পুরসভা নেয়নি। অনেকেই অভাবের তাড়নায় অথবা রাজনৈতিক চাপে প্রমোটারদের হাতে পুরানো বাড়ি তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রমোটারদের হাত থেকে গরিব মানুষের ঘরবাড়ি, তাদের সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্ব সি পি এম সরকার নিচ্ছে কি? এ প্রশ্নের উত্তর আমার থেকে আপনারা ভাল জানেন। তাহলে কী উন্নয়ন হচ্ছে? উন্নয়ন হচ্ছে কর্পোরেট হাউসের কর্তাদের চলাফেরার জন্য, বিত্তবানদের জন্য নানাবিধ সুবন্দোবস্ত। কায়েম হয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি আর দলবাজি।

বস্তির পর বস্তিতে প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মতো মানুষ জীবনযাপন করছে। আপনারাও জানেন বস্তিগুলির কী নিদারুণ অবস্থা। একবার বৃষ্টি হলে উল্টোডাঙ্গায়, বেহালায় বা কলকাতার প্রায় বেশিরভাগ জায়গায়, বিশেষত গরিব মানুষরা যেখানে বসবাস করেন, তাঁদের রান্নাঘর, খাবার ঘর, শোয়ার ঘরের মধ্যে রাস্তার জল ঢুকে যায়। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের টাকায় তাহলে তারা কী করেছে? ফলে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, আন্ত্রিক রোগ প্রতিরোধের কথা বলুন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থার কথা বলুন, জলনিকাশির কথা বলুন, এখানকার সবুজায়নের ক্ষেত্রে পার্কগুলিকে রক্ষা করার কোনও ব্যবস্থা বলুন, জলাশয়গুলিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা বলুন, আজকে সি পি এম ফ্রন্ট সরকার বা বিগত কংগ্রেস পরিচালনাধীন পুরসভা কোনও কিছুই করেনি। সারা পশ্চিমবাংলায় যেখানেই তারা পুরসভা দখল করে বসে আছে সর্বত্র কনর্ভাসান (জমির চরিত্র বদলের) চার্জ, জলকর সহ অন্যান্য কর বহুগুণ বাড়িয়েছে। অথচ তারা এই নির্বাচনে অনেক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের বলতে চাই। আমাদের দল মনে করে "রাইট টু রিকলের" অধিকার নির্বাচকদের থাকা দরকার। নির্বাচনে জিতে জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব না পালন করলে বা দুর্নীতিগ্রস্ত হলে নির্বাচকদের অধিকার থাকবে সেই প্রতিনিধিকে ফিরিয়ে নেওয়ার।

এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে এই পৌর নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ছি। এই নির্বাচনে সকলের সমর্থন আমরা আশা করি।

প্রশ্নোত্তর —

প্রশ্ন — আপনি বললেন যারা ক্ষমতায় ছিল তারা কিছু করেনি। আপনারাও তো কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার অংশীদার, এ বিষয়ে কী বলছেন।

উত্তর — আমাদের দল কেন্দ্রীয় সরকারের অংশীদার, একথা ঠিক নয়। আপনাদের সকলের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, আমাদের দলের সাংসদ ডাঃ তরুণ মন্ডল লোকসভায় বিরোধী আসনে বসেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সকল জনবিরোধী নীতির আমরা লোকসভার অভ্যন্তরে বিরোধিতা করেছি এবং আমাদের সাংগঠনিক শক্তি অনুযায়ী গোটা দেশজুড়ে সাধারণ মানুষকে নিয়ে আন্দোলনও গড়ে তুলছি, সম্প্রতি ২৭ এপ্রিল সমগ্র দেশে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল সংগঠিত করেছি। সাংসদ তরুণ মন্ডল লোকসভার বাজেট, লালগড়ে যৌথবাহিনী পাঠানো, গ্রিনহান্ট, পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং আয়লা দুর্গতদের উপযুক্ত ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং পি টি টি আই ছাত্রদের সমস্যার সমাধানে দাবি জানিয়েছেন এবং এ সব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। কিছু সংবাদপত্রে সে খবরও প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন — আপনারা তো জয়নগরে তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে ভোটে জিতেছেন, এখন পার্লামেন্টে যেখানেই বসুন। এ বিষয়ে কী বলবেন?

উত্তর — এ কথা সত্য নয়। আপনারা জানেন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে আমাদের দলের ঐক্য গড়ে ওঠে। সি পি এমের সমর্থনে তখন কেন্দ্রীয় সরকার চলছিল এবং কংগ্রেস তখন নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরে সি পি এম সরকারের নৃশংস হামলার পক্ষেই ছিল। কংগ্রেস দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী প্রধান বিশ্বস্ত দল। এজন্য তৃণমূল কংগ্রেস যখন লোকসভার ভোটে কংগ্রেসের সাথে জোটবদ্ধ হয়, আমরা তার বিরুদ্ধে ছিলাম। আমরা ৯ টি কেন্দ্রে কংগ্রেস ও সি পি এমের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছিলাম। কংগ্রেস জয়নগরে অফিসিয়ালি প্রার্থী না দিলেও আমাদের হারাবার জন্য দুই জন কংগ্রেস কর্মীকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করিয়েছিল, এছাড়া তারা আর এস পি-কেও কিছু কিছু জায়গায় ভোট দিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা অবশ্যই আমাদের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছিল, যেমন আমাদের কর্মীরা রাজ্যের সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের জন্য কাজ করেছে।

প্রশ্ন — আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের এখনও কেন এ অবস্থা, জেলা পরিষদ তৃণমূল কংগ্রেসের, আপনারা তার সহযোগী, পঞ্চায়েতগুলি আপনাদের জোটের। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

উত্তর — আমরা মনে করি, আয়লা দুর্গতদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দায়িত্ব পালন করছে না। আপনারা হয়ত জানেন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আয়লা দুর্গত এলাকার বেশিরভাগ গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি সিপিএম-এর দখলে আছে। আর আয়লার ত্রাণ বলুন, পুনর্বাসন বলুন, বাঁধ তৈরি বলুন, পুকুর সংস্কার বলুন, ফ্লাড শেল্টার তৈরি বলুন— এগুলি করে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকার ১০০০ কোটি টাকা দাবি করেছিল, সম্পূর্ণ না দিলেও ৫৪৪ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে। যদিও আমরা মনে করি কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ টাকা দিয়েছে তা আয়লা বিধ্বস্তদের পক্ষে খুবই অকিঞ্চিতকর। আমরা দাবি করেছিলাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নয়, পাবলিক কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে রিলিফ দেওয়া হোক। কিন্তু তা তারা করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় টাকা নিয়ে সিপিএম চরম বৈষম্য, দুর্নীতি ও দলবাজি করেছে। কেন আয়লা দুর্গতদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা এতদিনেও হয়নি, তার উত্তর সি পি এম-কে দিতে হবে। তাদের প্রশ্ন করুন। তাদের কাছে হিসাব চান। বন্যা কবলিত হাজার হাজার মানুষ আজও গৃহহারা। এই সরকার এতবড় নিষ্ঠুর যে সহায় সম্বলহীন এই দুর্গত মানুষরা প্রশাসনের কাছে তাদের দুঃখের কথা জানাতে গেলে তাদের উপর এই সরকার তার পুলিশবাহিনী দিয়ে অত্যাচার নামিয়ে এনেছে। আমাদের দল দুর্গত মানুষদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে লড়ছে। আজ থেকে গোসাবার আয়লা কবলিত মানুষ আমরণ অনশন শুরু করেছেন।

অথচ দেখুন, বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশও সমুদ্র উপকূলে বাঁধ যেভাবে বেঁধেছে, ফ্লাড শেল্টার করেছে, সি পি এম ৩৪ বছরেও তা করেনি। এমনকী বিপন্ন মানুষদের উদ্ধার করতেও উদাসীন নেতারা আসেননি। তারাই আবার আয়লার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জেলায় বনধ্ করছে। কতবড় নিষ্ঠুর রসিকতা ভেবে দেখুন।

প্রশ্ন — তৃণমূল নেত্রী অভিযোগ করেছেন, সি পি এম নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর ষড়যন্ত্র করছে, এ তথ্য তাঁর কাছে আছে। এই অভিযোগ সম্পর্কে আপনারা কী মনে করেন।

উত্তর — ব্রিটিশ আমল থেকেই দেখা গেছে শাসক সম্প্রদায় যখন চাপে পড়ে তখনই তারা সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটিয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে জনগণের ঐক্যকে ভাঙতে চেষ্টা করে। ইংরেজ শাসকরা বারবার এ কাজ করেছে। স্বাধীন ভারতেও জনগণের ঐক্যকে ভাঙতে কংগ্রেসও সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিয়েছে। তৃণমূল নেত্রীর কাছে কী তথ্য আছে জানি না, তবে ইতিপূর্বে জ্যোতি বসু আদবানীর তথাকথিত রামরথকে পুরুলিয়ায় ঢুকতে দিয়েছিলেন, সেখানে দাঙ্গা হয়েছে। বছর দুয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু বলেছিলেন এই রাজ্যের মাদ্রাসাগুলি পাকিস্তানের গুপ্তচর তৈরির কারখানা। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতা এমন উস্কানি পেয়েছে যে, স্বয়ং আদবানি বুদ্ধবাবুকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

প্রশ্ন — তৃণমূল কংগ্রেস-এর সঙ্গে মাওবাদীদের সম্পর্ক আছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কী?

উত্তর — এটা সঠিক নয়। মুখ্যমন্ত্রী কোনও প্রমাণ দিতে পারেন. নি। বরং মাওবাদী নেতারা স্বীকার করেছেন যে ইতিপূর্বে সি পি এম নেতাদের সঙ্গে চুক্তিমতো তারা কেশপুর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে উচ্ছেদ করে সি পি এমের দখলে এনে দিয়েছে। আর এখন তো যে কোনও আন্দোলন বা প্রতিবাদকেই 'মাওবাদী' লেবেল লাগিয়ে বুদ্ধবাবু সেই আন্দোলন দমনের ফ্যাসিবাদী সুযোগ গ্রহণ করেন। তাদের গদি রক্ষার এটা চতুর কৌশল। আর লালগড়ে নিজেদের লোককে 'মাওবাদী' সাজিয়ে সি পি এম অ্যাকশন করাচ্ছে, এটা ওখানকার জনগণই বলছে।

প্রশ্ন — আপনি বললেন এই পৌরসভায় ক্ষমতায় যারা ছিল তারা কোন কাজ করেনি। ২০০০-০৫ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের বোর্ড ছিল, তারা কী করেছে।

উত্তর — আমরা মনে করি স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত গোটা পিরিয়ডেই কাজ হয়নি। যে সময়ের কথা বলছেন, সেসময়ে আমাদের সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের জোট ছিল না। যদিও তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর সাথে তাঁর দলের পুর পরিচালকদের নানান প্রশ্নে দ্বন্দ্ব ছিল।

জামসেদপুরে পরিচারিকাদের বিক্ষোভ

পরিচারিকাদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে ২১ মে জামশেদপুরে ডি এম অফিসে বিক্ষোভ

গ্রীসের সংকটে বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারে ঘোর অমানিশা

একটি গোটা রাষ্ট্রই দেউলিয়া? আজকের দিনে শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও, বাস্তবে ঠিক সেটাই ঘটেছে গ্রীস নামক ইউরোপের দেশটির ক্ষেত্রে। শুধু গ্রীস নয়, প্রায় একই অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে স্পেন ও পর্তুগালও। শেষমেষ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, অর্থাৎ ইউরোপের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক জোট এবং আই এম এফ ৭৫ হাজার কোটি ইউরো (৮৫০ কোটি ডলার) সাহায্য দিয়ে ইউরোপকে এই মুহূর্তে রক্ষা করেছে। পাশাপাশি শুধু গ্রীসের জন্যই তারা সাহায্য দিয়েছে ১১ হাজার কোটি ইউরো। কিন্তু এই 'উদ্ধার তহবিল' ঘোষণার আগেই ইউরোপের সংকটের ধাক্কা বিশ্বায়িত পুঁজির বাজারে কাঁপন ধরিয়ে দেয়, যার জেরে ভারতের শেয়ার বাজারের সূচকও নিচে নেমে গিয়েছে। বিশ্বের বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যাদের ব্যবসাই হল বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে পুঁজি খাটিয়ে শেয়ার কেনা-বেচার মধ্য দিয়ে মুনাফা লোটা, তারা ঝুঁকি এড়াতে হুড়মুড় করে ভারতীয় শেয়ার বেচে দিয়ে পুঁজি তুলে নিল। তাদের আশঙ্কা, ইউরোপের সংকটের ঢেউ ভারতের অর্থনীতিতে এসে পড়লে তার ধাক্কায় ভারতীয় মুদ্রার দাম কমে যেতে পারে। তার পরিণামে ভারতীয় মুদ্রায় তাদের বিনিয়োগ করা পুঁজির মূল্যও কমে যাবে। অতএব তারাও রাতারাতি হাজার হাজার কোটি টাকার শেয়ার বেচে দিয়ে অন্যত্র ঝুঁকিহীন মুনাফার আশায় চলে যায়, ভারতের তেজি শেয়ার বাজারের সূচকও নেমে যায়।

এখন, গ্রীসের মতো একটা গোটা দেশের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কী? বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে মহামন্দা চলছে, তার সাম্প্রতিক সূচনাটা ঘটেছিল ২০০৮ সালে আমেরিকার লেম্যান ব্রাদার্স-এর মতো ১০৮ বছরের পুরনো একটি বিশাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের দেউলিয়া ঘোষণা থেকে। পরপর আরও বহু ব্যাঙ্ক ও কোম্পানিতে লালবাতি জ্বলেছিল। এদের দেউলিয়া ঘোষণার অর্থ ছিল, এরা নিজেদের গচ্ছিত সম্পদের চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়েছিল, ফাটকায় খাটিয়েছিল। ফলে বাইরের দায় মেটাবার আর্থিক ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলেছিল এবং নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে দিয়েছিল। এদের বাঁচিয়েছে মার্কিন সরকার, সেজন্য বিপুল পরিমাণ ডলার ভরতুকি সাহায্য দিয়েছে ওদের।

গ্রীসের ক্ষেত্রেও সংকট অনেকটা সেইরকমই। গ্রীসের পূর্বেকার সরকার ঋণ করেছিল দেদার। সরকারি ঋণপত্র বা বন্ড বিক্রি করে গ্রীস ফ্রান্স, জার্মানি সহ অন্য দেশের বহু ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাপক পরিমাণ ঋণ নিয়েছিল, নানা ঋণদানকারী সংস্থাও সরকারি বন্ড কিনে ঋণ দিয়েছিল। বাজারে নির্দিষ্ট সুদ ও মেয়াদে সরকারি ঋণপত্র (বন্ড) ছেড়ে ঋণ সংগ্রহের নীতি সকল পুঁজিবাদী দেশের সরকারগুলোই অনুসরণ করে। সরকারি শীলমোহর থাকার ফলে সরকারি ঋণপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি হয়। আবার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থার শরিক দেশ হওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক ঋণের বাজারে গ্রীস বিশ্বাসযোগ্যতাও পেয়েছিল। ঋণপত্রের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হলে, যারা ঋণপত্র কেনে, তারা সেই ঋণপত্র সরকারকে ফেরৎ দিয়ে সুদসহ আসল অর্থ দাবি করে এবং সরকারও তা দিতে বাধ্য থাকে। গ্রীসের ক্ষেত্রে এই সময়টা আসতেই বিপদ ধরা পড়ল।

গ্রীসের সরকার যত ঋণপত্র বাজারে ছেড়েছিল, তার অধিকাংশেরই মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কথা মে মাসে। হিসাবে দেখা গেল, ঋণপত্র বা বন্ডের ক্রেতারা দাবি করলে সরকারকে ৯ মে-র মধ্যে প্রায় ১১০০ কোটি ইউরো ফেরত দিতে হবে। অথচ সরকারি কোষাগার প্রায় শূন্য। এই বিপুল পরিমাণ ঋণের অর্থ শোধ করার মতো আর্থিক ক্ষমতা গ্রীস সরকারের নেই। অর্থাৎ গ্রীস রাষ্ট্র দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে, কোষাগারে গচ্ছিত অর্থের চেয়ে তার ঋণের পরিমাণ বেশি।

গ্রীসের সরকারি কোষাগারের এই বেহাল অবস্থা সরকার বা আন্তর্জাতিক নানা লগ্নিকারী সংস্থার অজানা ছিল, একথা কখনই বিশ্বাস্য নয়। তবু তারা এ নিয়ে হৈ চৈ আগে তোলেনি এই কারণেই যে, গ্রীস যদি ডোবে, অভিন্ন 'ইউরো' মুদ্রা ব্যবস্থার শরিক হওয়ার সুবাদে অন্য রাষ্ট্রগুলোও ডুববে, ফলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গ্রীসকে সাহায্য দিতে বাধ্য হবে। শুধু ইউরোপই নয়, আমেরিকার বহু ব্যাঙ্কও মুনাফা লুটতে গ্রীসকে ঋণ দিয়েছে। ফলে তারাও হাত গুটিয়ে থাকতে পারবে না। ঝুলি থেকে বেড়াল যখন বেরিয়ে পড়ল, তখন বিশ্ববাজারে আলোড়ন পড়ে গেল, আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাগুলো হুঁশিয়ারি জারি করে দিল যে, গ্রীসকে ঋণ দিলে ডুবতে হবে, অতএব কেউ তাকে আর ঋণ দিও না। ফলে, ইতিপূর্বে গ্রীস সরকার বিশ্ববাজারে আরও ঋণ নিয়ে পুরানো ঋণ শোধ করার যে উপায় অবলম্বন করত, তাও বন্ধ হয়ে গেল। এই অবস্থাতেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং আই এম এফ ঘোষণা করল যে, মেয়াদ শেষ হওয়া বন্ডগুলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিনে নেবে এবং গ্রীস ঋণ নিলে তার গ্যারান্টারও থাকবে তারা।

বিশ্বের পুঁজিবাদী সরকারগুলো যখন নানাভাবে এ কথা প্রচার করছে যে, মহামন্দার কালো মেঘ কেটে যাচ্ছে, ঠিক তখনই গ্রীস, স্পেন ও পর্তুগালের মধ্য দিয়ে ইউরোপের ভয়াবহ সংকটের চেহারাটা প্রকাশ পেয়ে 'মন্দা কেটে যাওয়ার' গল্পের ফানুস ফাটিয়ে দিয়েছে। বিপুল সরকারি ঋণের যে সংকটে গ্রীস পড়েছে, ব্রিটেন সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশও তার থেকে মুক্ত নয়, এমনকী যে জার্মানি এখন অর্থনৈতিক শক্তিতে ইউরোপের শীর্ষে রয়েছে তার ঋণের পরিমাণও ব্যাপক। ফলে, তুলনায় পশ্চাদপদ ও দুর্বল গ্রীসকে শুধু দায়ী করে লাভ নেই, সকল পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশই ঋণের পথেই অর্থনীতিতে অক্সিজেন জোগানোর উপায় নিয়েছে। বিপুলায়তন ফিনান্স পুঁজি, যা উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে শুধু ঋণ, ফাটকা, শেয়ার বাজারের কেনা-বেচা সহ এ জাতীয় অর্থ ব্যবসার দ্বারা বিশ্বজুড়ে মুনাফা লুটে আরও স্ফীত হয়ে উঠেছে, সকল পুঁজিবাদী দেশই এখন সেই বিপুলায়তন আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির ভজনা করছে। এর সাহায্যেই অর্থনীতি চাঙ্গা রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে, তথাকথিত 'গ্রোথ', 'উন্নয়ন' নিশ্চিত করছে। কিন্তু এই ফিনান্স পুঁজির চরিত্র বা ধর্মই হল, সামান্য বাড়তি লাভের আশায় কোনও দেশে যেমন হু হু করে ঢুকবে, তেমনই হাওয়া একটু খারাপ বুঝলেই রাতারাতি চম্পট দেবে।

গ্রীসও এই মডেলেই চলেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের শরিক হওয়ার সুবাদে, গ্রীসের পূর্বতন সরকার ঋণ করে গিয়েছে ধারাবাহিক ভাবে। মন্দার বাজারে ইউরোপের ব্যাঙ্কগুলিতে জমা অর্থের পরিমাণও বিপুল। ফলে তারাও গ্রীসকে দেদার ঋণ দিয়েছে। কিন্তু তা শোধ দিতে হলে গ্রীসের সরকারি কোষাগারে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হওয়া দরকার, তা হয়নি। গ্রীসে 'ট্যুরিজম' বা ভ্রমণই হচ্ছে অন্যতম প্রধান শিল্প। উৎপাদন শিল্পে গ্রীসের স্থান খুব উচ্চে নয়। দ্বিতীয়ত, নয়া উদারনীতিবাদী ফর্মুলা অনুযায়ী ধনীদের উপর, বিভিন্ন কোম্পানির উপর সরকার ট্যাক্স বাড়াতে পারবে না, বরং তা কমাতে হবে। পুঁজিকে তার খুশিমতো খেলতে দিতে হবে। ঋণের বাজারে সুদ কমিয়ে রাখতে হবে, অর্থাৎ দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ক্রমাগত মুনাফা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে হবে সরকারকে।

গ্রীসের সরকারি ঋণের পরিমাণ বরাবরই বেশি ছিল। কিন্তু ২০০৬ সাল থেকে তা অতি দ্রুত ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। ২০০৯ সালে সরকারি ঋণ দেশের মোট আয়ের (জিডিপি) ১৩ শতাংশ হয়ে যায়। গ্রীসের আমদানি-রপ্তানি আয়-ব্যয় বা ব্যালান্স অফ পেমেন্টস, যাকে কারেন্ট অ্যাকাউন্টসও বলা হয়, সেখানেও ঘাটতি বাড়ছিল। যার অর্থ হচ্ছে, পণ্য ও অন্যান্য জিনিস রপ্তানি করে গ্রীস যা আয় করে, অন্যদেশ থেকে পণ্য আমদানি করতে ব্যয় হয় তার থেকে বেশি। ফলে ঘাটতি অনিবার্য। এই ঘাটতি মেটাতেও সরকার ঋণ বাড়িয়ে যায়। অনেকে বলছেন, পণ্য উৎপাদন শিল্পে দুর্বল অবস্থার জন্য গ্রীসের পণ্য ইউরোপের বাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না। বিশ্ববাজারে দেশীয় পণ্যের বিক্রি বাড়াবার জন্য দাম কম রাখতে নিজস্ব মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটানোর পথ বহু পুঁজিবাদী দেশই নেয়। কিন্তু গ্রীসের সে উপায় নেই। কারণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের শরিক কোনও দেশ নিজের মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটাতে পারে না। ফলে গ্রীসের কাছে ঋণই হয়ে দাঁড়ায় দেশের বাজারে চাহিদা সৃষ্টির ও তা বাড়াবার প্রধান উপায়। জার্মানি ও অন্যান্য দেশগুলো এ বিপদের দিকে দৃষ্টি দিতে চায়নি। কারণ, তাদের দেশের পণ্যসামগ্রী গ্রীসে রপ্তানি হচ্ছিল ভালই। তাদের ব্যাঙ্কগুলো ঋণের সুদে আরও ফুলে ফেঁপে উঠছিল। এদের কর্তারা, ফিনান্স ব্যবসার মালিক ও শীর্ষ ম্যানেজাররা পকেট ভর্তি করেছে দেদার। তাদের আয় বাড়ছিল বিপুল হারে। ফলে ফ্রান্স, জার্মানির পুঁজিবাদী সরকারগুলো খুশিই ছিল।

গ্রীস সরকারের 'বেহিসাবি' ব্যয়কে দায়ী করে একদল বলছেন, গ্রীসের সরকার 'দায়িত্বহীনভাবে' শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি-বেতন-পেনশন বাড়িয়ে গেছে ধার করা অর্থে। কিন্তু গ্রীসের পুঁজিবাদী সরকারকে আর যাই হোক, শ্রমিক-কর্মচারী দরদী বলা যায় না। আসলে মন্দা কবলিত দেশের বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করে অর্থনীতিকে চালু রাখার ও তথাকথিত 'গ্রোথ' বজায় রাখার জন্য এছাড়া অন্য কী পথ আছে আজকের পুঁজিবাদী সরকারগুলোর সামনে? শিল্পের বিকাশ নেই, কৃষির বিকাশ নেই, বেকার বাড়ছে — এই অবস্থায় ব্যক্তিগত ঋণ, গৃহঋণ, গাড়ির জন্য ঋণ, বেড়াবার জন্য ঋণ — এমন হাজারো ঋণের জালে ক্রেতা জনগণকে বেঁধে, অন্যদিকে সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা কিছুটা বাড়িয়েই তো আজ দেশে দেশে পুঁজিবাদ বাঁচতে চাইছে। সাম্প্রতিক মহামন্দার ধাক্কায় কঙ্কালটা বেরিয়ে পড়েছে। না হলে হয়তো আরও কিছুদিন চাপা থাকত।

এখন আই এম এফ সরকারি ব্যয়সঙ্কোচের হুঙ্কার ছেড়েছে। গ্রীস সরকার এই পথে যেতে বাধ্য হলে অচিরেই দেখা যাবে গ্রীসের গ্রোথ (জিডিপি) বা উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়েছে। বিশ্বের সব পুঁজিবাদী দেশেরই এই হাল হবে। তাই স্টিগলিৎসের মতো নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদরা এই বলে চেঁচাচ্ছেন যে, আই এম এফ-এর ফর্মুলা মেনে সরকারি বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয় কমালে সর্বনাশ হবে। গ্রোথ উবে যাবে। এ জন্যই তিনি আই এম এফ-এর ফর্মুলার বিরোধী। আসলে আই এম এফ-স্টিগলিৎস দু পক্ষই পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে চায়। কিন্তু মন্দার যে বুনিয়াদি সংকটে আজ সব পুঁজিবাদী দেশই কাতর, স্টিগলিৎস বা আই এম এফ — কারও ফর্মুলাই সেই মূল সংকট থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে পারছে না।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও আইএমএফ এখন যে বিপুল পরিমাণ ইউরো/ডলারের থলি নিয়ে 'ত্রাণকর্তা'র ভূমিকায় নামল, তারা ত্রাণ দিয়ে উদ্ধার করল কাদের? বড় বড় ব্যাঙ্ক ও ফিনান্স কোম্পানিকে। গ্রীসকে এরা যে ঋণ দিয়েছিল, সুদ সমেত সে টাকা তারা ফেরত পেল। তাহলে, এই সংকটের কোপ পড়ছে কাদের উপর? গ্রীসের শ্রমিক-কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষের উপর। সরকারি ব্যয়সংকোচের হুকুমে তাদের বেতন পেনশন কমছে, চাকরি যাচ্ছে, শিল্প-স্বাস্থ্যে সরকারি সাহায্য ছাঁটাই হচ্ছে, কলে-কারখানায় মজুরি কমছে, ছাঁটাই চলছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সংকট থেকে ফিনান্স পুঁজির কারবারিদের কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। তারা যত ঋণই দিক, ব্যাঙ্কগুলো যত ফাটকার কারবারই করুক, তাদের লোকসান নেই। বিপদে পড়লে তাদের উদ্ধারের জন্য জনগণের ট্যাক্সের টাকা বরাদ্দ হয়ে যাবে। কিন্তু রেহাই নেই শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের। এ জন্যই বিশ্বে একদিকে বিলিয়নপতির সংখ্যা যেমন বাড়ছে, অন্যদিকে দ্রুত হারে বাড়ছে বেকার ও ক্ষুধার্ত জনগণের সংখ্যা।

কিন্তু এই উদ্ধার ফর্মুলার দ্বারাও পুঁজিবাদ বাঁচবে না। বেতন সংকোচন, ছাঁটাই শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুযোগ হ্রাস ইত্যাদির ফলে দেশে ক্রেতার সংখ্যা বা আভ্যন্তরীণ বাজারও তো সংকুচিত হবে, সরকারের রাজস্বও কমবে। তাহলে উৎপাদন ও 'গ্রোথ' বাড়বে কী উপায়ে? এই মূল প্রশ্নটাও পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের অনেকে তুলেছেন। আসলে, এই দুষ্টচক্র থেকে বেরোবার রাস্তা পুঁজিবাদে নেই। গ্রীসের সংগ্রামী জনগণ ও সকল পুঁজিবাদী দেশের জনগণকে এই মূল সত্য বুঝেই সঠিক লড়াইয়ের পথ নির্ধারণ করতে হবে।

ব্যাঙ্ক কর্মচারী স্বার্থবিরোধী বেতন ও পেনশন চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান

ব্যাঙ্ক শিল্পে সদ্য সমাপ্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী ১ এপ্রিল ২০১০ থেকে যাঁরা ব্যাঙ্কে চাকরি পাবেন তাঁরা ব্যাঙ্কের প্রচলিত পেনশন স্কিমের আওতাভুক্ত হবেন না। সরকার বা ব্যাঙ্ক এইসব কর্মচারীদের পেনশন দেবে না। নিজেদের বেতন থেকে টাকা দিয়ে নতুন পেনশন স্কিমের সদস্য হতে হবে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশনের এই চুক্তিতে সই করেছে এ আই বি ই এ, এন সি বি এ এবং বি ই এফ আই-এর ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন (ইউ এফ বি ইউ)। কর্মচারী স্বার্থের পরিপন্থী এই চুক্তির বিরোধিতা করছে অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম (এ আই বি ই ইউ এফ)। এই চুক্তিতে আরও বলা হয়েছে, ১-১১-২০০৭ থেকে চুক্তির দিন অর্থাৎ ২৭-৪-২০১০-এর আগে যে সব ব্যাঙ্ক কর্মচারী অবসর নিয়েছেন তাঁদের প্রচলিত পেনশন প্রকল্পে থাকতে হলে আজ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক যে অনুদান দিয়েছে তার সুদ সহ আরও ৫৬ শতাংশ টাকা কর্তৃপক্ষকে ফেরত দিতে হবে। আশ্চর্যের বিষয় হল, এরা সকলে নবম দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতাভুক্ত ছিলেন— এরা মারাত্মক বঞ্চনা ও অবিচারের শিকার হলেন।

পেনশন প্রকল্পের আরও ক্ষতিকর দিকের সাথে বেতনেও বঞ্চনা হয়েছে। কর্মচারীদের দাবি ছিল, প্রতি বছর ডি এ মূল বেতনের সাথে এক করে দিতে হবে, তা মানা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ডি এ মূল বেতনের ৫০ শতাংশ হয়ে গেলে সেটা বেসিকের সাথে এক করা হয় — এই চুক্তিতে সেটাও করা হয়নি। ১-১১-২০০৭-এ ডিএ ছিল ৩০২০ কনজ্যুমারস প্রাইস ইনডেক্স (সিপিআই) এর ভিত্তিতে, ডি এ মার্জ হয়েছে ১-১১-০৬ এর ২০৩৬ সি পি আই ধরে। ফলে মূল বেতন কমল। গ্রাচ্যুইটি ও পেনশনে তার প্রভাব পড়বে।

কর্মচারী স্বার্থবিরোধী এই চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১২ জুন বেলা ৩টায় কলকাতার অ্যাংলো গুজরাটি হলে সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কনভেনশন-এর ডাক দিয়েছে এ আই বি ই ইউ এফ।

প্রসঙ্গ স্ট্যালিন

একটি অনবদ্য সংকলন গ্রন্থ

'সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়েই আমরা অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছি।' এভাবেই নিজেদের প্রয়াসকে চিহ্নিত করেছে বারাসতের প্রকাশনা সংস্থা 'প্রমিথিউসের পথে।' কী সেই অসাধ্য সাধন? ওদের কথায়, মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীদের ও মার্কসবাদের আলখাল্লা পরা আধুনিক শোধনবাদীদের যে অবিরাম কুৎসা, তার উদ্দেশ্য হল মেহনতি শোষিত মানুষের হাত থেকে মানবমুক্তির দর্শন মার্কসবাদকে কেড়ে নেওয়া, সাম্যবাদী আন্দোলনের মূল আদর্শগত ভিত্তিকেই দুর্বল করে দেওয়া। এ জন্যই 'প্রমিথিউসের পথে' মনে করে, 'এ যুগে যাঁরা বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, তাঁদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল — সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ও শোধনবাদী চক্রের মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে দেওয়া, ওদের প্রচারযন্ত্রের ধূম্রজাল ছিন্ন করে স্ট্যালিনের সত্যকার পরিচয় জনগণের সামনে হাজির করা।' অত্যাচার, গণহত্যা, স্বাধীনতাহরণ ইত্যাদি যেসব অভিযোগ হামেশাই স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে তোলা হয়, তার উত্তর সন্ধান করেছে 'প্রসঙ্গ স্ট্যালিন।' আজ বিশেষ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিতে এই কঠিন কাজকে 'অসাধ্য সাধন' বলে মনে করছে 'প্রমিথিউসের পথে'।

চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটির প্রথম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে দেশ বিদেশের স্মরণীয় মনীষী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদদের ৪৮টি প্রবন্ধ ও কবিতা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আইনস্টাইন, বার্নার্ড শ', জাঁ-রিশার ব্লখ, চার্চিল, পাবলো পিকাসো, জে ডি বারনাল, জে বি এস হলডেন, পল রবসন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, এম এন রায়, জওহরলাল নেহেরু, আচার্য বিনোবা ভাবে, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, জাঁ পল সার্ত্রে, শিবদাস ঘোষ প্রমুখ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে ৬ জন খ্যাতনামা মানুষের স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ — যা ব্যক্তি স্ট্যালিনকে নানাদিক থেকে বুঝতে সাহায্য করে। তৃতীয় অধ্যায় সমৃদ্ধ হয়েছে তৎকালীন বাংলার ১৩ জন কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকের চোখে স্ট্যালিন যেমন প্রতিভাত হয়েছেন তার বৃত্তান্ত — কবিতা গল্প আর প্রবন্ধে। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, 'স্তালিনের কথা'য় লিখেছেন, '...স্তালিনকে ক্ষুদ্র ও খর্ব করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্তালিন আজ লক্ষ কোটি নরনারীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে উপবিষ্ট।... দূরে সরিয়া থাকিয়া এক রহস্যময় জীবনের মোহজাল দ্বারা জনমণ্ডলীকে আচ্ছন্ন করিবার মতো ডিক্টেটরী মনোবৃত্তি তাঁহার কোনো কালে ছিল না। রাশিয়ার আর দশ জন সাধারণ মানুষের মতোই তিনি সকলের সহিত মিশিয়া অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেন।...আমাদের দেশের সাধারণ আমলারাও স্তালিন অপেক্ষা অধিকতর আরাম আয়েশে থাকে।'' সমরেশ বসু'র 'একটি মুখ' গল্পটি অনবদ্য, বার বার পড়তে ইচ্ছা করে।

আর সর্বশেষ চতুর্থ অধ্যায়ে আছে মারিয়া সৌসা-র এমন একটি লেখা, যার আধার সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সংরক্ষণশালা, যেখানে পার্টির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও তথ্য সংরক্ষিত ছিল।

লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর প্রদর্শিত পথে নিঃস্ব, দুর্ভিক্ষ কবলিত সোভিয়েট রাশিয়াকে স্ট্যালিন শিক্ষায়, খাদ্যে, চিকিৎসায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, অর্থনীতিতে, সমরবিজ্ঞানে ও পরমাণুশক্তিতে বিশ্বে প্রথম সারির শক্তির রাষ্ট্রে পরিণত করেন। পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি মালিকানা ও শোষণমূলক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে সোভিয়েট রাশিয়ায় সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করেছিলেন তিনি। রাশিয়ার বুকে পুঁজিবাদের এই নিশ্চিত মৃত্যু যা পরবর্তীকালে বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করেছিল, তা দেখে আতঙ্কিতের দল বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিতে ঘটনার মিথ্যা বিবরণ আর মনগড়া তথ্যকে হাতিয়ার করেছিল। এমনই একজন ছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল। সেই চার্চিলের কথায় ''যাকে আমি আঁতুড়েই গলাটিপে হত্যা করতে চেয়েছিলাম এবং হিটলারের আবির্ভাবের আগে যাকে আমি সভ্য স্বাধীনতার ভয়ঙ্কর শত্রু বলে মনে করতাম, সেই গোমড়ামুখো শয়তান বলশেভিক রাষ্ট্রে আমার আগমন নিয়ে গভীর ভাবনায় মগ্ন হলাম।'' এরপর স্ট্যালিনের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় বসে নিজ কৃতকর্মের কথা ভেবে চার্চিলের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেই তথ্য পাঠকদের চমকে দেবে।

যুদ্ধবাজ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে স্ট্যালিনের রাশিয়াকে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়া থেকে নির্মলকুমারী মহলানবীশকে ১৯৩০ সালে লিখেছিলেন, ''এরাই 'লীগ অফ নেশনস্'-এ অস্ত্র বর্জনের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়ে কপট শান্তিকামীদের মনে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। কেন না নিজেদের প্রতাপবর্ধন বা রক্ষণ সোভিয়েটদের লক্ষ্য নয় — এদের সাধনা হচ্ছে জনসাধারণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-সম্বলের উপায়-উপকরণকে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে ব্যাপক করে গড়ে তোলা। .....কিন্তু তুমি তো জান, 'লীগ অফ নেশনস্'-এর সমস্ত পালোয়ানই গুণ্ডাগিরির বহু বিস্তৃত উদ্যোগ কিছুতেই বন্ধ করতে চায় না, কিন্তু 'শান্তি চাই' বলে সকলে মিলে হাঁক পাড়ে। এজন্যই সকল সাম্রাজ্যিক দেশেই অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবনের চাষ অন্নের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে।''

'প্রসঙ্গ স্ট্যালিন' বইটির শেষে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাটি ছাপা হয়েছে। তারিখ ৭ মার্চ ১৯৫৩। প্রথম সংবাদ বড় বড় হরফে লেখা আছে 'পরলোকে মার্শাল স্ট্যালিন'। এর নিচেই একটু ছোট অক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে আছে 'পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়কের জীবনাবসান।' খুব স্বাভাবিক কারণেই পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগবে, যে মানুষকে 'পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক' হিসাবে ভূষিত করা হচ্ছে, তাঁকেই আবার নিষ্ঠুর অত্যাচারী লক্ষ লক্ষ মানুষের হত্যাকারী বলে হেয় প্রতিপন্ন করতে নিষ্ফল অন্তহীন প্রয়াস কেন। পত্রিকার পাতায় আরও লেখা আছে, 'বিরোধ বিক্ষুব্ধ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় স্ট্যালিনের প্রভাব', 'ভারতীয় সংসদে শ্রী নেহেরু ও ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের শ্রদ্ধাঞ্জলি, লোকসভা ও রাজ্য পরিষদের অধিবেশন স্থগিত, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক' ইত্যাদি। এই শোকপ্রস্তাবে কী বলা হয়েছিল তাও আমরা দেখতে পাই 'প্রসঙ্গ স্ট্যালিনে'র পাতায়। স্ট্যালিনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেদিন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, ''যুদ্ধ ও শান্তি উভয় প্রশ্নে তিনি মহান। তাঁর মধ্যে যে অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও সাহস আমরা দেখেছি তা একান্তই বিরল। যখন তাঁর সম্পর্কে ইতিহাস লেখা হবে তখন হয়ত অনেক কথাই বলা হবে। আমরা জানি না, ভাবী প্রজন্ম তাঁর সম্পর্কে কত রকমের ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করবে। কিন্তু এই বিষয়ে সবাইকে একমত হতে হবে, তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি যুগনিয়ন্তা। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য নয়, যেভাবে দেশকে তিনি গড়ে তুলেছেন সেই কারণে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন''। পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগবে একজন অত্যাচারী, হত্যাকারী কি দেশ গড়ে তুলতে পারেন, স্মরণীয় হন?

প্রসঙ্গ স্ট্যালিন বইটিতে আরও দেখা যায়, সোভিয়েট রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে নেহেরু বলেছেন, ''.......পরিকল্পনার বিপুল কর্মোদ্যোগ শুরু হল ১৯২৯ সালে। আবার চতুর্দিক ব্যাপ্ত করে দেখা দিল বিপ্লবী তেজ। আদর্শের আহ্বান জনগণের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করল। ...এই সংগ্রাম ছিল রাশিয়ার পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের অবশেষের বিরুদ্ধে, জনসাধারণের হীন অবস্থার বিরুদ্ধে।'' এই একই প্রসঙ্গে স্ট্যালিনের সময়ের ছবি তুলে ধরেছেন নেহেরু, যা থেকে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের কারণের একটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, ''কুলাক বা ধনী চাষিদের উপর উচ্ছহারে তিনি কর বসিয়েছিলেন এবং এই অর্থ গ্রামীণ যৌথ খামারে ব্যয় করতে শুরু করলেন। ... কুলাক ও ধনী কৃষক এই নীতির ফলে ক্ষুব্ধ এবং সোভিয়েট সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হল। আর এই ভয় থেকেই তারা তাদের গৃহপালিত সমস্ত পশু ধ্বংস করল। এত বিপুল পরিমাণে এই ধ্বংসযজ্ঞ চলল যে, পরের বছর খাদ্যদ্রব্য, মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্যের ভয়ঙ্কর আকাল দেখা দিল।'' এমন সব অনেক অজানা দিক আছে 'প্রসঙ্গ স্ট্যালিন' বইটির পাতায়।

রবীন্দ্রনাথ তখনকার রাশিয়া সম্পর্কে তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেছেন, ''এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভাল লেগেছে সে হচ্ছে এই ধনগরিমার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এ দেশের জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভুষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত হয়েছি তেমনি আনন্দিত হয়েছি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কি আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে।'' তাই নিজেকে মেলে ধরে বলছেন, ''রাশিয়ায় এসেছি — না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।''

স্ট্যালিন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে 'প্রসঙ্গ স্ট্যালিন' সংকলন গ্রন্থটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে — এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বইটি সর্বাঙ্গসুন্দর হত যদি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুবাদের মানটা উন্নত হত, মুদ্রণ প্রমাদ মুক্ত হত। বিশেষ করে মারিয়া সৌসা-র প্রবন্ধটি এদিক থেকে দুর্বল, মূল বিষয়টি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একটা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। হয়ত পরের সংস্করণে বর্তমান ত্রুটি দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে প্রকাশকরা যত্ন নেবেন। বাংলার বাইরে বৃহত্তর পরিসরে তাঁদের এই মহৎ প্রচেষ্টা তুলে ধরতে 'প্রমিথিউসের পথে' স্ট্যালিন সম্পর্কে আরও অনেক খ্যাতনামা মানুষের লেখায় সমৃদ্ধ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার একটি ইংরেজি সংকলন গ্রন্থ 'অন স্ট্যালিন' প্রকাশ করতে চলেছে। যার আনুমানিক মূল্য ২০০ টাকা। গ্রাহক হলে ১০০ টাকা। তাঁদের এই উদ্যোগ সার্থক হোক।

পরিশেষে যাঁর কথা 'প্রসঙ্গ স্ট্যালিন' বইটি থেকে বলব, তিনি জোসেফ ডেভিস। ইনি মস্কোয় আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। জাঁ রিশার ব্লখের লেখা থেকে জানা গেল, স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা প্রসঙ্গে ডেভিস তাঁর মেয়েকে বলেছিলেন, ''ধৈর্য্যে ও প্রজ্ঞায় প্রবলচেতা বলে মনে হয় তাঁকে দেখে। কোমল প্রীতিরসে ভরা তাঁর বাদামি রঙের চোখ দুটি। মনে হয় যেন শিশুরা ভালবাসবে তাঁর কোলে বসে থাকতে। ... অত্যন্ত সুরসিক, প্রকাণ্ড তাঁর মনীষা, ক্ষুরধার বুদ্ধি, সবচেয়ে বড় কথা খুবই চতুর। তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রুরা তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলে, একেবারে তার বিপরীত কথাটি যদি ধারণা করতে পারো, তাহলেই স্তালিনের সঠিক চিত্রটি পাওয়া যাবে।'' অবশ্যই সংগ্রহে রাখার মতো অনবদ্য একটি সংকলন।

প্রকাশক ঃ প্রমিথিউসের পথে
এ/২ শুভ অ্যাপার্টমেন্ট, ভাটরা পল্লী, বারাসত,
উত্তর ২৪ পরগণা
ফোন ঃ ৯৩৩২০২৭৭২৬

মাতঙ্গিনী ব্লকে বার্ধক্যভাতা ও মজুরির দাবিতে বিডিও ঘেরাও

২০ মে অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বে বিধবা ভাতা ও বার্ধক্যভাতা প্রাপক ৮০/৮৫ বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সহ তিন শতাধিক মানুষ মেদিনীপুরের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বিডিও-কে দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে রাখেন। বিক্ষোভকারীরা জানান, বার্ধক্যভাতা প্রাপকরা প্রায় নয় মাস ভাতা না পেয়ে অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, বিধবাভাতা এখনও চালুই হয়নি। এ বিষয়ে ব্লক প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। আন্দোলনের চাপে বিডিও ১৫ দিনের মধ্যে বার্ধক্যভাতা পাওয়ার বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলে ঘেরাও ওঠে। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, ১০০ দিনের প্রকল্পে শ্রমিকরা কাজ করে ৪/৫ মাস পরেও মজুরি পাচ্ছে না। কাজ দিতে না পারলে বেকারভাতা পাওয়ার আইনি অধিকার থেকেও এই ব্লকের জবকার্ড হোল্ডাররা বঞ্চিত হচ্ছেন।

ডেপুটেশনে অংশ নেন কার্তিক বেরা, প্রবীর প্রধান, কার্তিক শী, রাধানাথ সামন্ত, রতন মাইতি প্রমুখ কৃষক নেতৃবৃন্দ। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন অশোক মাইতি, দিলীপ মাইতি প্রমুখ।

মিত্র স্কুলে অচলাবস্থা কাটল

সাময়িক অচলাবস্থা কাটিয়ে কলকাতার ঐতিহ্যমণ্ডিত স্কুল মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেন) আবার পুরনো ছন্দে ফিরল। ইতিপূর্বে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ধারাবাহিক দুর্নীতি এবং স্বেচ্ছাচারের কারণে স্কুলে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। স্কুলের অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শুভাকাঙ্ক্ষী বিদ্যানুরাগী মানুষদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল 'মিত্র স্কুল গার্জেনস ফোরাম'। ফোরামের সক্রিয় প্রতিবাদের ফলস্বরূপ প্রধান শিক্ষককে সাসপেন্ড করা হয় গত ২৯ এপ্রিল। এর পর বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসে। ২১ মে স্কুল প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তীর আয়োজন করে গার্জেনস ফোরাম। উপস্থিত সকলেই স্কুলের শৃঙ্খলা ও গৌরব রক্ষার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

কোচবিহারে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র স্টাডি ক্লাস

১৫-২০ মে কোচবিহার পঞ্চশহিদ মঞ্চে প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় জেলা স্টাডি ক্লাস। আলোচ্য বিষয় ছিল শিক্ষার উপর নানা আক্রমণ, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে ভিত্তি করে বিপ্লবী আন্দোলনের উপযুক্ত সৈনিক হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলার সংগ্রাম প্রভৃতি। স্টাডি ক্লাস পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র সর্বভারতীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ কমরেড নভেন্দু পাল এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নেপাল মিত্র। ক্লাস আয়োজনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন পার্টির জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার। কমরেড শিবদাস ঘোষের 'গণআন্দোলনের সমস্যা ও ছাত্রদের কর্তব্য' বইটির উপর উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ক্লাস সঞ্চালনা করেন ডি এস ও-র জেলা সম্পাদক কমরেড মৃণাল কান্তি রায়।

প্রধানমন্ত্রী আবার প্রমাণ করলেন গোটা কংগ্রেস দলটাই একটি বিশেষ পরিবারের পদতলে সমর্পিত

একের পাতার পর

অফিসার-প্রযুক্তিবিদ-ব্যবসায়ীর আর্থিক বৃদ্ধি বোঝায় তবে আলাদা কথা, আর যদি দেশের আপামর জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি বোঝায়, তবে প্রধানমন্ত্রীর এই বিবৃতিকে সেই জনসাধারণের সঙ্গে নীরস ঠাট্টা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়! সরকার অনুসৃত নীতির ফলেই এই সময়ে ধনী-দরিদ্রে ফারাক বেড়েছে ব্যাপক হারে। মুষ্টিমেয় ধনী আরও ধনী হয়েছে, আরও কোটি কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে নেমে গেছে। ১৯৯০ সালে তথাকথিত 'সংস্কার' শুরু হওয়ার সময়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানব উন্নয়ন সূচকে ভারতের স্থান ছিল ১২৩। আজ তা ১২৮তম স্থানে নেমে এসেছে।

প্রশ্ন হল, প্রধানমন্ত্রী যে মূল্যবৃদ্ধি কমিয়ে আনার আশ্বাস দিয়েছেন, তার জন্য তিনি বা তাঁর সরকার কী কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছে? প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সংকট, মন্দা, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়া এবং গত বছরে দেশে একই সঙ্গে খরা ও বন্যার প্রকোপে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে।'' মূল্যবৃদ্ধির যে কারণগুলির কথা প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, তা কি বাস্তবসম্মত? প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য বিষয়ের সাথে খরা ও বন্যার উপর মূল্যবৃদ্ধির দায় চাপিয়ে দিয়েছেন। যেন খরা বা বন্যা আমাদের দেশে নতুন ঘটনা, যা আগে কখনও ঘটেনি। বা এসব যে ঘটতে পারে তা সরকারের জানা ছিল না। যদি প্রধানমন্ত্রী তা-ই মনে করেন, তবে তো সরকারের দায়িত্ববোধ নিয়েই প্রশ্ন উঠবে। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে, তিনি বা তাঁর সরকার মূল্যবৃদ্ধি মোকাবিলাকে কতখানি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ যে মজুতদারি, কালোবাজারি, রেশন ব্যবস্থার দুর্নীতি— সে সবের কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেননি। মূল্যবৃদ্ধির কারণই যদি সরকার ঠিকমতো নির্ণয় করতে না পারে, তবে তার মোকাবিলা করবে কী করে? নাকি প্রধানমন্ত্রী সব জেনেও মজুতদার-কালোবাজারিদের আড়াল করতেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে নীরব রইলেন? অবশ্য প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ না করলেও গত ১৭ ডিসেম্বর অর্থদপ্তরের সংসদীয় কমিটি তার রিপোর্টে মূল্যবৃদ্ধির জন্য মজুতদারিকেই দায়ী করেছে। খাদ্যশস্যের জোগান কম, চাহিদা বৃদ্ধি, খরা-বন্যার জন্য উৎপাদন হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতিকে কোনও আমল না দিয়ে কমিটি বলেছে, মজুতদাররাই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দাম বাড়াচ্ছে। বলেছে, দিল্লিতে চাল, গম, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি পণ্যে খুচরো দরে বিরাট পার্থক্য। অর্থাৎ মজুতদাররা এক দফা জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে, আবার তাদের কাছ থেকে কিনে খুচরো দোকানদাররাও জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে। ভুক্তভোগী জনসাধারণ জানে, শুধু দিল্লি নয়, গোটা দেশেরই চিত্র এটি। জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ারও বলেছিলেন, মজুতদারিই মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রককে সুপারিশ করেছিল মজুতদারি এবং ফাটকাবাজি নিয়ন্ত্রণে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন সংশোধন করার জন্য। কংগ্রেসই এই আইনকে শিথিল করে অত্যাবশ্যক পণ্যের তালিকা থেকে ধান, চাল, গম, মোটা দানাশস্য, চিনি, তেলবীজ, তেল ইত্যাদি ১২টি পণ্যকে বাদ দিয়েছে এবং এগুলির ব্যবসায় লাইসেন্স নেওয়া, মজুত করা ও পণ্য চলাচলে যে নিয়ন্ত্রণ ছিল, তা তুলে দিয়েছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী এই আইন সংশোধন করে মজুতদারি রোধের বিষয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। তারপরেও তিনি কীভাবে বলেন, সরকার মূল্য পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রেখে চলেছে? আসলে কেন্দ্রীয় সরকার মাঝে মাঝে কিছু বৈঠক, সেখান থেকে কিছু বিবৃতি আর দশ জন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে একটি কোর গ্রুপ তৈরি ছাড়া প্রায় আর কিছুই করে উঠতে পারেনি। মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে লাগাতার। আর তার চাকায় পিষ্ট হয়ে চলেছে দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ।

মূল্যবৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামবৃদ্ধিকে দায়ী করেন কী করে? আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের ওঠানামার সাথে সত্যিই কি ভারতের বাজারে তেলের দাম নির্ভর করে? আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম নামতে নামতে যখন ৭০ ডলারেরও নিচে নেমে এসেছিল, তখন কি মনমোহন সিংয়ের সরকার দেশীয় বাজারে তেলের দাম কমিয়েছিল? তেল কোম্পানিগুলি প্রভূত পরিমাণ লাভ হওয়া সত্ত্বেও গত বাজেটে তেলের দাম বাড়ানো হল। আবারও তাঁরা তেলের দাম বাড়াতে চলেছেন। তা হলে আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই দেওয়া কেন? দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করা, আর তেল কোম্পানিগুলির মুনাফা স্ফীত করা ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? একইভাবে তিনি মূল্যবৃদ্ধির জন্য মন্দার উপরেও দায় চাপিয়েছেন। একবার তিনি বলছেন, ভারতীয় অর্থনীতিতে মন্দা তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি, আবার বলছেন, মন্দার জন্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। তিনি কি মনে করেন তাঁর এই পরস্পর বিরোধী কথা দেশের মানুষ বিশ্বাস করবে?

দেশের সত্তর শতাংশ মানুষ কৃষির সাথে যুক্ত হলেও সেই কৃষি নিয়ে সরকারের কী ভাবনা, তারও কোনও উল্লেখ প্রধানমন্ত্রী করেননি। যেমন তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ নেই— শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের ফলে এগুলি যে ক্রমাগত সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, সরকার তার জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য কম খাদ্য উৎপাদনকে দায়ী করলেও, উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকার আদৌ কিছু করছে কি না, তারও কোনও উল্লেখ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে নেই। খরা বা বন্যা পরিস্থিতিকে মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী করলেও এ সবের মোকাবিলায় সরকার নতুন কী ব্যবস্থা নিয়েছে, বা আদৌ কোনও ব্যবস্থা নিয়েছে কি না, বা খরা মোকাবিলার জন্য সেচ ব্যবস্থার কী পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে— এ সবের কোনও উল্লেখ প্রধানমন্ত্রী করেননি। ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করছে। এর বিরুদ্ধে সরকার কোনও ব্যবস্থা নিয়েছে কি না, তার কোনও উল্লেখ প্রধানমন্ত্রী করেননি।

প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় অর্থনীতির স্থায়িত্ব বোঝাতে বলেছেন, মন্দার আক্রমণে বড় বড় দেশগুলির যখন বেহাল অবস্থা, তখনও ভারতীয় অর্থনীতি নাকি সেই আক্রমণ সামাল দিয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একবারও উল্লেখ করেননি যে, মন্দা সামাল দেওয়ার নামে মালিকদের লাভের অঙ্ক অটুট রাখতে সরকার জনগণের ট্যাক্সের কত লক্ষ কোটি টাকা ভরতুকি এবং করছাড় দিয়েছে এবং আজও দিয়ে চলেছে। একবারও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেননি 'মন্দা সামাল দেওয়ার জন্য' কত লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীর চাকরি বলি দেওয়া হয়েছে, বা ছাঁটাই হওয়া সেই শ্রমিক-কর্মচারীদের রক্ষা করতে সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে। কোটি কোটি বেকারের কর্মসংস্থানের জন্য গত এক বছরে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সে ব্যাপারেও কোনও উচ্চবাচ্য করেননি।

দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের বয়স এক বছর হলেও দুর্নীতিতে এই সরকারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। মন্ত্রীসভার তাবড় সদস্যরা জড়িয়ে পড়েছেন নানা দুর্নীতিতে। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শশী থারুরের আই পি এল কেলেঙ্কারির খ্যাতি দেশের সীমানা ছাড়িয়েছে। টেলিকম মন্ত্রী এ রাজার টু-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত চলছে। এইসব দুর্নীতি ছাড়াও আর জে ডি, এস পি, বি এস পি নেতানেত্রীদের দুর্নীতির তদন্তগুলি কেন মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল সে নিয়েও প্রধানমন্ত্রী কোনও শব্দ খরচ করেননি।

সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, মার্কিন সরকারের সঙ্গে ইউ পি এ সরকারের ক্রমাগত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির কারণ কী? প্রধানমন্ত্রী এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে বরং পরমাণু চুক্তির শর্ত অনুসারে ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পরমাণু চুল্লি সরবরাহ কোম্পানিগুলির স্বার্থরক্ষাকারী 'সিভিল লায়াবিলিটি বিল' পার্লামেন্টে পাশ করানোর পক্ষেই সওয়াল করে গেলেন। ফলে ভারত-মার্কিন ঘনিষ্ঠতা ভারতীয় জনগণের কোন স্বার্থে লাগছে, তার কোনও স্পষ্ট জবাব কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দিলেন না।

জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে উচ্চবাচ্য না করলেও রাহুল গান্ধী যে একজন পূর্ণমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছেন, তা জানাতে ভোলেননি প্রধানমন্ত্রী। এমনকী তিনি যে প্রধানমন্ত্রী পদেরও যোগ্য হয়ে উঠেছেন, তারও উল্লেখ করেছেন। অবশ্য কীসে রাহুল গান্ধী এমন যোগ্য হয়ে উঠলেন তার কোনও উল্লেখ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে নেই। গান্ধী পরিবারের সন্তান হওয়া ছাড়া রাহুল গান্ধীর আর বিশেষ কী যোগ্যতা রয়েছে? কী সংগ্রাম করেছেন তিনি দেশের মানুষের জন্য? তাঁদের জন্য কী ত্যাগ স্বীকার রয়েছে তাঁর? আজন্ম বিত্ত-বৈভবে লালিত রাহুল গান্ধী কতটুকু বোঝেন তাদের দুঃখ-কষ্ট, প্রয়োজনবোধকে? তা হলে কীসে তিনি নেতা হওয়ার যোগ্য হয়ে উঠলেন? আসলে গোটা কংগ্রেস দলটাই যে একটি পরিবারের পায়ে সমর্পিত, মনমোহন সিং সেটাই প্রমাণ করলেন।

সব মিলিয়ে বর্ষপূর্তিতে দেশবাসীর আশা করার মতো কিছুই শোনাতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী। বাস্তবে সরকার যে নীতি নিয়ে চলছে, সেই বিশ্বায়ন-উদারনীতির অবশ্যম্ভাবী ফল এই বৈষম্যবৃদ্ধি, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি। যত দিন যাবে এ সবই আরও বাড়তে থাকবে। শোষিত-বঞ্চিত মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়বে। কোনও স্তোকবাক্য, কোনও শান্তির বাণী তাদের আটকে রাখতে পারবে না। আজ প্রয়োজন শোষিত মানুষের ঐক্য। এই প্রয়োজনীয়তার কথাই মানুষের আজ বোঝা দরকার।

এয়ার ইন্ডিয়ার স্বৈরাচারি ভূমিকার তীব্র নিন্দা করলেন শ্রমিক নেতা কমরেড শঙ্কর সাহা

এয়ার ইন্ডিয়া শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা-কর্মীদের বরখাস্ত ও সাসপেনশনের বিরুদ্ধে এ আই ইউ টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা এক বিবৃতিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরেও এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের সহযোগিতায় দু'টি ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের একতরফাভাবে এবং স্বৈরাচারী নির্দেশে যেভাবে বরখাস্ত করেছে এবং অন্য নেতাদের সাসপেন্ড করেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কোনও নিয়মবিধির তোয়াক্কা না করে যেভাবে ইউনিয়নের স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে তা শ্রমিক-কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের মৌলিক অধিকারকে খর্ব করেছে। আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি।

তিনি বলেন, ভারত সরকারের প্রাইভেটাইজেশন, বিলগ্নিকরণ ইত্যাদি নীতির পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত ও সাসপেনশনের মধ্য দিয়ে তাদের সৃষ্টি করা শ্রমিক অশান্তিকে অজুহাত করে এয়ার ইন্ডিয়াকে বেসরকারিকরণের রাস্তা তৈরি করছে। বরখাস্ত ও সাসপেনশন অবিলম্বে প্রত্যাহার করে এয়ার ইন্ডিয়া কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের অবহেলিত গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি নিয়ে আলোচনার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করার জন্য তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানান।

জঙ্গলমহল আন্দোলনের সংগঠক বিবেকানন্দ সাউ মুক্ত

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট সংগঠক, জঙ্গলমহলে দরিদ্র আদিবাসী মানুষের বাঁচার লড়াইয়ের ঘনিষ্ঠ সাথী কমরেড বিবেকানন্দ সাউকে রাজ্য সরকারের পুলিশ ২০০৯ সালের ২৮ জুলাই খুন, লুঠ, অগ্নিসংযোগ, সরকারি কাজে বাধা প্রভৃতি মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু পুলিশ কোনও অভিযোগই প্রমাণ করতে পারেনি। ১০ মাস পর ২৭ মে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা স্পেশাল কোর্ট তাঁকে বেকসুর খালাস দেয়। ওই দিনই তাঁকে নিয়ে এক বিশাল মিছিল মেদিনীপুর শহর পরিক্রমা করে। কালেক্টরেটের সামনে অনুষ্ঠিত এক সভায় দল ও বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সভায় কমরেড সাউ বলেন, আমি মুক্ত হলেও আরও বহু নিরীহ মানুষকে সরকার এইভাবে মিথ্যা অভিযোগে জেলে পুরে রেখেছে। এই লড়াইয়ের পাশে আমি থাকব। সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে গণআন্দোলনের কর্মীদের যেভাবে হয়রান করা হচ্ছে, সভায় তার তীব্র নিন্দা করা হয়। ছবি— বক্তব্য রাখছেন কমরেড বিবেকানন্দ সাউ, পাশে জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি।

R.N.I. No 5268/60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

ঝাড়খণ্ডে গণপ্রতিরোধে পিছু হটল ভূষণ স্টিল

গরিব আদিবাসীদের জমি জবরদস্তি দখল করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব সিংভূম জেলার পোটকায় দীর্ঘদিন ধরে উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলন চলছে। এর আগে ভূষণ স্টিল কোম্পানি লোভ দেখিয়ে, পুলিশ-প্রশাসনকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে ম্যানেজ করে গ্রামবাসীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। কিন্তু স্থানীয় মানুষদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চাপে সমস্ত অপচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কেস দেওয়া হয়েছে, তাদের গ্রেপ্তার করে জেলেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবুও তারা নতি স্বীকার করেনি। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রথম থেকেই সর্বশক্তি নিয়ে এই আন্দোলনে সক্রিয় রয়েছে এবং অন্যান্য সংগঠনের সাথে যুক্তমোর্চা গঠন করে গণকমিটির মাধ্যমে এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর ভূষণ স্টিল কোম্পানি হঠাৎ ঘোষণা করে যে, কোম্পানি খোলার জন্য ভূমি পুজো করবে। কংগ্রেস, বিজেপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের এই উপলক্ষে তারা আমন্ত্রণ জানায়। ভূমি পুজোর বিরুদ্ধে যাতে কোনও বিক্ষোভ না হয়, সে জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। কিন্তু গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ১৫ মে রাত থেকেই ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে গোটা এলাকাকে ঘিরে ফেলে এবং ‘জনতা কার্ফু’ জারি করা হয়। ভূমিপুজোর নির্দিষ্ট সময়ে কোম্পানির ডাইরেক্টর বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে হাজির হন, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের ফলে সেখানে পুজো করতে ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের গাড়ির মিছিল সেখানে এসে পৌঁছায়। জনতা তাদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়। এই আন্দোলন পুঁজিপতিদের দালাল এইসব দলগুলির মুখোশ টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে। গণপ্রতিরোধের ফলে নির্ধারিত স্থানের বহুদূরে গিয়ে কোম্পানি ভূমিপুজো করে। কিন্তু জনগণ সেখানেও ধাওয়া করে গিয়ে শিলান্যাসের পাথর উপড়ে ফেলে দেয়। এখন প্রশাসন আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করার ষড়যন্ত্র করছে। এই আন্দোলনে কমরেড সীতারাম টুডু, সনকা মাহাতো, অমিত রায়, ধীরেন ভগৎ, উপাসিনী সরদার, অম্বিকা মাহাতো, বীরেন বারিক, সুনীল মাহাতো প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

গুজরাটে উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

গুজরাটে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) জনগণের সমস্যা নিয়ে একের পর এক আন্দোলন করে যাচ্ছে। ডাং জেলায় জলের ব্যবস্থা, ভাঙাচোরা রাস্তার মেরামতি, বেহাল বাস পরিষেবার উন্নতি, সরকারি হাসপাতালে উপযুক্তমানের চিকিৎসা, চাকরির সুযোগ বাড়ানো, চিনি কারখানায় ভিন রাজ্য থেকে কাজ করতে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যার সমাধানের দাবিতে এবং শিক্ষার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর জেলা সংগঠনী কমিটি দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন পরিচালনা করছে।

সম্প্রতি বিভিন্ন নদীর উপর কতকগুলি বাঁধ তৈরির সরকারি পরিকল্পনার ফলে এক বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায় চলে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে ডাং জেলা সংগঠনী কমিটি লিফলেট বিলি, স্বাক্ষর সংগ্রহ ও গণকমিটি গঠন করে সংগঠিত আন্দোলন পরিচালনা করছে। হাজার হাজার স্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৬২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। ১৩ মে ডাং জেলা সদরে অনুষ্ঠিত এক জনসমাবেশে আদিবাসীদের জীবনের ভয়ঙ্কর দুর্দশা এবং বনবিভাগের অফিসার ও পুলিশের দ্বারা নানা হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। পার-তাপি-নর্মদা নদী সংযুক্তিকরণের জন্য গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের দুই মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে নতুন দিল্লিতে যে ‘মৌ’ স্বাক্ষরিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে সভায় কয়েক হাজার মানুষের সমর্থনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, পার, আউরুঙ্গা, অম্বিকা, পূর্ণ এবং তাপি নদীর অতিরিক্ত জল নর্মদায় নিয়ে যাওয়াই তাপি-নর্মদা সংযুক্তিকরণের প্রধান লক্ষ্য। এর মধ্যে ৪০১ কিমি জুড়ে বিভিন্ন নদীর উপর সাতটি জলাধার করার প্রস্তাব আছে। যার ফলে ৭.৫৫৯ হেক্টর জমি ডুবে যাবে। এতে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ, ৯ হাজারের বেশি গৃহপালিত পশু এবং ৭৫টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২৪টি গ্রাম পুরোপুরি জলের তলায় চলে যাবে। প্রস্তাবিত জেহেরি, পাইখেড়, চাষমন্দা ও চিক্কার বাঁধের পাদদেশে গড়ে তোলা পাওয়ার হাউসের জন্য ২২৪৭টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ডাং জেলার পশ্চিম অংশে নিচু তরাই অঞ্চলে ডাং শহরকে ঘিরে যে তিনটি বাঁধ হবে তার ফলে অনেক এলাকা ডুবে যাবে। বহু গ্রাম, সেখানকার মানুষজন, গৃহপালিত পশু বিপন্ন হবে। ডাং-এর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত কৃষিনির্ভর মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। ওয়াগহাই, শকরপাতাল, পিম্পরি প্রভৃতি এলাকায় যে সাপ্তাহিক বাজার বসে তা মার খাবে। কারণ এইসব এলাকার মানুষ প্রস্তাবিত বাঁধের এলাকার মধ্যে বসবাস করে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। জনসাধারণ তথাকথিত এই উন্নয়ন প্রোজেক্টের ফলে দীর্ঘস্থায়ী ভয়ঙ্কর ক্ষতির মধ্যে পড়বে।

প্রস্তাবে পার-তাপি-নর্মদা সংযুক্তিকরণ প্রজেক্ট বাতিল, সংরক্ষিত অথবা নোটিফায়েড এলাকার দোহাই দিয়ে ডাং এলাকার কোনও গ্রাম স্থানান্তরিত না করা, গরিব মানুষদের নাম বিপিএল তালিকাভুক্ত করা ও কার্ড দেওয়া, চাষিদের জমির সনদ দেওয়া, আদিবাসীদের জঙ্গলের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের হয়রানি বন্ধ প্রভৃতি ১২ দফা দাবি করা হয়েছে।

মিটিং শেষে কমরেডস মীনাক্ষি জোশি, জয়েশ প্যাটেল, লক্ষণ বাগুল, ভারত ভোই, রঘু বাগুল জেলা কালেকটরেটের কাছে স্মারকলিপি দেন। পরে এই প্রতিনিধি দল যেসব এলাকা জলের তলায় চলে যেতে পারে সেই সব এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে। এলাকার জনগণ প্রতিনিধিদের কাছে প্রস্তাবিত প্রোজেক্ট-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন, প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেন এবং আন্দোলন পরিচালনায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সমস্ত রকম সাহায্য চান।

পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রে তীব্র গণ আন্দোলন

মহারাষ্ট্রের উপকূলবর্তী জেলা রত্নগিরিতে ১০ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা জেলা উত্তাল। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে ১৬ মে এখানে একটি গণশুনানির আয়োজন করা হয়। শুনানি চলাকালীন হলের বাইরে কয়েক হাজার মানুষ পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে স্লোগান সহযোগে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অধিকাংশই স্থানীয় কাজুবাদাম ও আম চাষি। তাদের অভিযোগ, এখানে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হলে স্থানীয় মানুষ নানা সমস্যার সম্মুখীন হবে, সমগ্র এলাকার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে মাছ চাষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফলের চাষাবাদও।

এই পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটির স্বত্বাধিকারী হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ‘নিউক্লিয়ার পাওয়ার করপোরেশন’ তথা এন পি সি। ইতিমধ্যে এন পি সি ১,৬৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দু’টি রিঅ্যাক্টর বসিয়েছে, এগুলি তৈরি করেছে এ্যাজেভা নামক একটি সংস্থা। সমগ্র প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১০২৬ কোটি টাকা। স্থানীয় গ্রামবাসী ও চাষিদের বিরোধিতার বিরুদ্ধে সাফাই গেয়ে এন পি সি কর্তৃপক্ষ বলেছেন, সমগ্র প্রকল্পটি সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং রিঅ্যাক্টর তৈরিতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সাফাইয়ে কান না দিয়ে পরিবেশবিদরা রাশিয়ার চেরনোবিলের দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছেন, সেখানেও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেও দুর্ঘটনাকে এড়ানো যায়নি, সেই দুর্ঘটনার রেশ আজও বয়ে বেড়াচ্ছে চেরনোবিলের মানুষ।

পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নানা রকম দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এবং পুরো বিষয়টি বেআইনি। প্রকল্প স্থাপনের জন্য মহারাষ্ট্র দূষণ পর্ষদ ও অন্যান্য সংস্থার কাছ থেকে নাকি প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়নি। তাছাড়া এই প্রকল্পে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কত দামে জনসাধারণের কাছে বিক্রি করা হবে, সে কথাও এন পি সি কর্তৃপক্ষ গোপন রেখেছেন। উত্থাপিত এ সব অভিযোগকে সামনে রেখে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে।

(সূত্র ঃ বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১৭-৫-২০১০)

পস্কো ইস্পাত প্রকল্প বাতিলের দাবি তথ্যানুসন্ধানী দলের

ওড়িশার জগৎসিংপুরে দক্ষিণ কোরিয়ার বহুজাতিক কোম্পানি পস্কো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেডি সরকারের সহায়তায় গরিব মানুষের জমি জবর দখল করে যে ইস্পাত প্রকল্প গড়ার চেষ্টা করছে, তা অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানিয়েছে একটি তথ্যানুসন্ধানী দল। এই দলে ছিলেন বিচারপতি, সমাজসেবী, অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মীরা। দলের নেতৃত্বকারী সদস্য বম্বে হাইকোর্টের পূর্বতন বিচারপতি এইচ সুরেশ পরিদর্শন শেষে ২৬ মে ভুবনেশ্বরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পস্কোর জন্য জমি অধিগ্রহণ স্থানীয় মানুষের সাংবিধানিক অধিকারকেই লঙঘন করছে। সাথে সাথে তিনি বলেন, ১৫ মে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের উপর বর্বর পুলিশি আক্রমণ মানবিক অধিকারকেও লঙঘন করেছে। পস্কো বিরোধী আন্দোলনের নেতা ও গ্রামবাসীদের উপর চাপানো মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারেরও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। গ্রামবাসীদের উপর পুলিশি আক্রমণের নিন্দা করে তাঁরা ঐ অঞ্চল থেকে পুলিশ সরিয়ে নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে গত পাঁচ বছর ধরে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করছে এলাকার মানুষ। বিভিন্ন সময় পুলিশি আক্রমণ হয়েছে, মিথ্যা কেস দেওয়া হয়েছে আন্দোলনকারীদের নামে, হত্যা করা হয়েছে অনেককে। “১৫ মে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর ওড়িশা পুলিশের আক্রমণ ছিল সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। এবং একটি গণতান্ত্রিক দেশে এ ধরনের আচরণের কোনও স্থান নেই। এই ঘটনায় শতাধিক মানুষ আহত হয়, পাঁচজনের আঘাত গুরুতর। ফৌজদারি আইন ভঙ্গ করে পুরুষ পুলিশরা মহিলাদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে”—বলেছেন পরিদর্শকরা। এমনকী যুদ্ধের সময়ও আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী আহতদের চিকিৎসা করানোর কথা, এক্ষেত্রে তাও ভঙ্গ করেছে ওড়িশা সরকার। “বেশ কিছু আহত ব্যক্তি বিনা চিকিৎসায় গ্রামের বাড়িতে পড়ে কাতরাচ্ছে। কারণ তারা আশঙ্কা করছে, গ্রামের বাইরে গেলেই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করবে।”

পরিদর্শক দলটি বলেছে যে, গ্রামবাসীরা তাদের জমি ছাড়বে না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তারা দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালিয়ে যাবে। “অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত অধিকাংশ জমিই উর্বর এবং জৈববৈচিত্র্যে ও পরিবেশ বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ।” তাঁদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “সমস্ত গ্রামবাসীই পুরুষানুক্রমে শত শত বছর ধরে তাদের জীবিকার জন্য ঐ জমির উপরই নির্ভরশীল। তাদের উচ্ছেদ করার অর্থ তাদের জীবন-জীবিকার উপরই আক্রমণ।”

(সূত্র ঃ দ্য হিন্দু, ২৭-৫-২০১০)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in